শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সেকাল ও একাল
৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

সুহৃদ্বরেষু—

বসন্ত রজনী

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

বৌবাজারের দিকে বাসা করার পর থেকে বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গে দেখা বড় একটা হ'য়ে ওঠে না। ওকালতির ঝঞ্ঝাট তো কম নয়। সকালে সিনিয়ারের বাড়ী একবার হাজিরা দিতে যেতেই হয়। মাঝে মাঝে (কথাটা চেপে যাওয়াই উচিত ছিল) তাঁর ছেলেমেয়েদের হোয়াইটওয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে জামা-কাপড়ও কিনে দিতে হয়। দুপুরে কোর্ট আছে এবং বিকালের দিকে প্রায়ই কোনো-না-কোনো মক্কেলের বাড়ী যেতে হয়। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই।

এমন সময় একদিন অজয়ের চিঠি পেলাম—সে মৃত্যুশয্যায়, আমাকে একবার দেখতে চায়। লেখা অজয়ের নিজের নয়, তার পিসতুতো বোন টুলুর। মেয়েলি হাতে লেখা। এক একটি মেয়ে দেখা যায়, বয়সের হিসাবে তাদের কৈশোর শেষ হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যায় না। অকারণে ক্ষণে ক্ষণে উঁচু হাসি, লঘু

চঞ্চল গতি এবং একটি অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক নির্লজ্জতা তথাপি টিকে থাকে। তেমন একটি তন্বী সুন্দরী মেয়ে এই টুলু।

অজয়ের সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,—আজকের নয়, যখন আমাদের দু'জনেরই বয়স কুড়ির নীচে ছিল, যখন একজন আর একজনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে পারতো, সেই সময়কার। ও যে বেশীদিন বাঁচবে না সে আমি জানতাম। কলেজে পড়বার সময়ই ওর কানের উপরটা এবং আঙ্গুলের ডগার মাংস কুঁচকে যেতে আরম্ভ করে। রোগের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। কিন্তু তাতে ও এতটুকু দমেনি,—সমানে পড়ে গেছে এবং লিখে গেছে। বাংলাদেশের সাহিত্য-পত্রিকাগুলি আজও ওর প্রশংসায় মুখর। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেই ওর অসুখ বাড়তে আরম্ভ করে। তার আগে ভালো বোঝা যেত না।

আমি যখন অজয়ের ওখানে গেলাম, ও তখন গলা পর্য্যন্ত একটা পুরু চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তখন সন্ধ্যের বেশী বাকী ছিল না। ও সুমুখের খোলা জানালা দিয়ে পশ্চিম গগনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার পানে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। টুলু শিয়রের দিকে একটা টিপয়ের পাশে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে কি কতকগুলো ওষুধের শিশি সাজাচ্ছিল।

আমি অতি সন্তর্পণেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কিন্তু যেভাবে টুলু আমাকে কলকণ্ঠে স্বাগত জানালে, তাতে মনে হ'ল এত সন্তর্পণে আসবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না! আশ্চর্য্য মেয়ে এই টুলু! মুমূর্ষু ভায়ের পাশে দাঁড়িয়েও তেমনি চঞ্চল, তেমনি উচ্ছল, তেমনি মুখর। টুলু বললে, এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল মৃণালবাবু!

অজয় যে আজ সন্ধ্যায় আমার প্রতীক্ষা করবে এ-তো জানা কথা। তবু বললাম, তাই নাকি?

টুলু যেন দিগ্বিজয় করেছে এমনিভাবে বললে, দেখলে দাদা, আমি বললাম, উনি নিশ্চয়ই আসবেন। তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি।

অজয়ের চোখ একটা পুরু চশমায় ঢাকা ছিল, দেখা যাচ্ছিল না। ওর মুখ বীভৎস দেখাচ্ছিল। নাক এবং ঠোঁট অসম্ভব রকম ফুলে উঠে ছিল। টুলুর কথায় ও একটু ক্ষীণ হাসলে।

চেয়ারটা আরো সরিয়ে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, এখন কেমন বোধ হচ্ছে ?

এ কথারও অজয় কোনো জবাব দিলে না : বললে, তোমার খবর কি ?

দেবার মতো খবর আমার অনেকই ছিল। আমি জানি, কোর্টের খবর ওর কম প্রিয় নয়। একটা ছোট ঘটনাকে আইন-ব্যবসায়ী সত্যি-মিথ্যায় কেমন জটিল ক'রে তোলে, কি আশ্চর্য্য নিপুণতায় একটা মামলার গতি ফিরিয়ে দেয়, সে কাহিনী শুনতে শুনতে ও উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, অধীর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ওকে দেখে সেদিন আমার মনটাই দমে গেল। বেশী কথা বলতে ইচ্ছেই হ'ল না। আমি শুধু ঘাড় নেড়ে জানালাম, ভালো।

—সবাই ভালো আছে ? আর আর বন্ধুরা ?

আমি এবারও ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

ও যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। আপন মনে অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বললে। যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, একা ও-ই অসুস্থ, আর সবাই ভালো আছে। খানিক পরে বললে, আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টুলু ?

—একটুখানি।

—তাই হবে। চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

অসুস্থ শরীর। একটু তন্দ্রা এলে সকলেই অমন কত স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অজয়ের সবটাতেই টুলুর আগ্রহ অপরিসীম ; ও অজয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, কি স্বপ্ন বলো না ?

অজয় একটু হেসে বললে, যাক্‌গে। সে শুনে তুই হাসবি।

—না, হাসবো না। তুমি বলো।

অজয় আস্তে আস্তে বললে, স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি যেন যুদ্ধে গেছি। মস্ত বড় একটা প্রান্তর। চারিদিক ধু ধু করছে। কোথাও একটা গাছ পর্য্যন্ত নজরে পড়লো না। যুদ্ধ করতে গেছি, কিন্তু একা আমি। আমার গায়ে চুম্‌কি করা মখমলের পোষাক, কোমরে তলোয়ার। কার সঙ্গে যুদ্ধ করছি জানি না; কিন্তু আমি কেবল চ্যাঁচাচ্ছি, আর প্রাণপণে তলোয়ার ঘুরোচ্ছি,—এতো ঘুরোচ্ছি যে গা দিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরতে লাগলো।

অজয় চুপ করলে।

টুলু যে ওর গল্প খুব মন দিয়ে শুনছিল তা বোধ হ'ল না। কিন্তু অজয় চুপ করতেই বললে, তারপর?

—তারপর আর নেই! আচ্ছা মৃণাল, মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন জানো?

অন্যমনস্কভাবে বললাম, না।

টুলু বললে, তুমি নিশ্চয়ই আজকে যুদ্ধের কথা ভেবেছ।

অজয় সবিস্ময়ে বললে, আমি? যুদ্ধের কথা?

টুলু আবার বললে,—আজ না হোক, এর মধ্যে কোনোদিন ভেবেছ নিশ্চয়।

এবারে অজয়ের যেন কি কথা মনে পড়ে গেল। বললে, তা হ'তে পারে। যুদ্ধ নয়, কিন্তু এই শীর্ণ হাতখানা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি, আমি যদি বলবান হ'তাম! বেশী না, এমনি সাধারণ মানুষের মতোও যদি হতাম!

টুলু এমন অদ্ভুত কথা যেন কখনও শোনেনি, এমনভাবে হেসে লুটিয়ে পড়বার মতো হ'ল।

বললে, তাহ'লে কি করতে? আমরাই বা কি করি? চুরি করি, না ডাকাতি করি, না খুন করি?

অজয় স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ টুলুর পানে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমি খুনও করতে পারি। মাঝে মাঝে ভয়ানক

খুন করবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাও নয় টুলু, আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই, শুধু সবারই মতো রাস্তা দিয়ে চলতে চাই, স্ত্রী-পুত্রের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে চাই। আর কিছু নয়।

অজয়ের গলার স্বর ভারী হ'য়ে এলো। কিন্তু সে স্বরে ক্লান্ত বিষণ্ণতা নেই, আছে একটা অতি তিক্ত ক্ষোভ। আমি সইতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, কথার ধারা এবার বদলাতে হবে।

কিন্তু টুলু বললে, তোমার তো রাস্তা দিয়ে চলার দরকার নেই দাদা, স্ত্রীপুত্রের জন্যে রোজগার করারও না। তোমার তো টাকার অভাব নেই।

উত্তেজনায় অজয় উঠে বসল। টান দিয়ে চশমাটা খুলে ফেলে বললে, সমস্ত দিয়ে দিতে পারি টুলু, আমার বাড়ী, আমাব ব্যাঙ্কের টাকা, সব, যদি একটি দিনের জন্যেও কেউ আমাকে ভালো ক'রে দিতে পারে। এ-জীবনে আমি অন্ততঃ একদিনও সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে পেলে ধন্য মানবো।

চোখ ফেটে যেন রক্ত ঝরছে এমনি লাল ওর চোখ। আর সওয়া গেল না। আমি তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করলাম, তোমার বৃন্দাবন কেমন লাগলো?

অজয় বিরক্তভাবে বললে, ছাই লাগলো।

—সেই নাটকখানি শেষ হয়েছে?

অজয় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, ওসব আর ভালো লাগে না,—বুঝেছ মৃণাল, সাহিত্যচর্চ্চাও আর ভালো লাগে না।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সে টুলুর সামনে নয়।

টুলুকে বললাম, আমি বরাবর কোর্টের ফেরত আসছি কি না, সে কথাটি একবারও জানতে চাইলে না?

টুলু আমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলে না। বললে, সে তো আমি জানিই।

—জানো যদি, তবে চা খাওয়ানোর উৎসাহ দেখছি না কেন ?

টুলু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, ভারী ভুল হয়ে গেছে মৃণালবাবু, আমি এক্ষুনি আসছি।

টুলু চলে গেল। আমি চেয়ারখানি অজয়ের বিছানার দিকে আরও সরিয়ে নিয়ে চুপি চুপি জিগ্যেস করলাম, আর তোমার সেই বৈষ্ণবী, তার খবর কি ?

এতক্ষণে অজয়ের মুখে হাসি ফুটলো। বললে, তার কথা কি তোমাকে লিখেছিলাম ?

—লেখোনি ? তারই কথাই তো কেবল লিখতে তোমার কথা আর ক'টা থাকতো ?

গভীর তৃপ্তির সঙ্গে হাসতে হাসতে অজয় বললে, তাই বটে। তারই তো কথা। আমার আর নতুন কথা কিই-বা ছিলো ! কিন্তু তুমি কি টুলুকে তাড়ালে এই জন্যে ?

হেসে বললাম, এইজন্যে। আমি তোমার কাছ থেকে সকল কথা শুনতে চাই।

—তা শোনো। কিন্তু টুলুকে সরাবার দরকার ছিল না। ও জানে। বিস্মিত হচ্ছ ? কিন্তু দোষটা কি শুনি ? স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে একথা সবাই জানে। সে যদি না দোষের হয়...

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না দোষ কিছুই নয়। তুমি বলো। অজয় বলতে লাগলো ঃ

—ওরা বলে কুঞ্জ ! বৃন্দাবন পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত জানিনে কোথায় গিয়ে উঠবো, কি করে থাকবো। কিন্তু ট্রেণ থেকে নেমে কিছুই আমাকে ভাবতে হ'ল না। কোথা থেকে কে এসে যে বাক্স-বিছানা সমেত আমাকে একটা কুঞ্জে নিয়ে গিয়ে ফেললে সে আজ আর মনে করতে পারি না। কেবল মনে আছে, কুঞ্জে গিয়ে যে দৃশ্যটি দেখলাম সেই কথা। সুমুখেই দাওয়ায় ব'সে একটা ঘোরতর কালো, বেঁটে স্থূলকায় ব্যক্তিকে পাঁচ-ছ'টি মেয়ে পরম যত্নে তেল

মাখাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, একেই বলে ভাগ্যবান। বাবাজি স্মিতহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অতি মিষ্টি ধীর কণ্ঠে বললেন, আজ তেল মাখানো থাক রাধা, আগে বাবুর ঘরটি ঠিক ক'রে দিয়ে এসো।

রাধার বয়স চব্বিশ-পঁচিশের কম না। দীঘল তনুদেহ ছাড়া গর্ব্ব করবার ওর কিছুই ছিল না।

আমি কিছুই ভুলিনি। বললাম, আর ওর হাসি? শীর্ণ, উদাস হাসি?

অজয় হেসে ফেললে। বললে, হ্যাঁ, ওর হাসিটি বেশ মিষ্টি। তুমি কিছুই ভোলনি দেখছি। প্রথম প্রথম আমি থাকলে আমার ঘরের মধ্যে আসতে সঙ্কোচ বোধ করত। কিন্তু ক'দিনেই বুঝলে, আমার মতো দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত নিরীহ লোকের কাছ থেকে ভয় করবার কিছু নেই। ক্রমেই ওর সাহস বাড়তে লাগলো। অজয় একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ জিগ্যেস করলে, আচ্ছা তুমি জীবন কাকে বলো?

আমি হেসে বললাম, বেঁচে থেকে ওকালতি করাকে।

কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশা ক'রে অজয় প্রশ্ন করেনি। আমার কথা ওর বোধ হয় কানেই গেল না। আপন মনেই বলতে লাগলো, সেই প্রথম দেখলাম জীবনের রূপ। স্বর্গের কল্পবনের বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধদ্বারের ছিদ্রপথ দিয়ে শুধু একবার একটুখানি দেখতে পেলাম— অফুরন্ত জীবনের স্রোত বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বয়ে চলেছে! তীরে পড়ে আছে কত মেখলা, কত মণিমঞ্জীর, কত আমীলিত লীলাকমল। তাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অফুরন্ত জীবনের খরস্রোত। শুধু দেখলাম। ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি তো নেই।

অজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—রোজ সন্ধ্যায় ওখানে কীর্ত্তন হ'ত। ঘরে শুয়ে শুয়ে আমি শুনতাম অভিসারিকার নিগূঢ় মর্ম্মকথা, অবরুদ্ধ অশ্রুর অস্ফুট গুঞ্জন।

জানালা দিয়ে দেখতে পেতাম দূরের বনশ্রেণী। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় রহস্যলোকের মতো। মনে হতো, এখুনি দেখা যাবে সুনীল বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে চির-অভিসারিকা ওই পথে চলেছে। চরণে মঞ্জীর নাই। নিঃশব্দ সে চলা।

বিন্দু বিন্দু ক'রে অজ্ঞাতসারে মনে জমছে রস, অকস্মাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে জিগ্যেস করলে, ঘুমুলে?

আমার মাথার চুলে কার যেন মৃদু স্পর্শ পেলাম। যাদু যে কোথায় ছিল, চাঁদের আলোয়, না দূরের নিঝুম বনপ্রান্তে, না নারীর মৃদুকণ্ঠে জানিনে। আমিও ফিস্ ফিস্ করে জবাব দিলাম, না।

আবার তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে সে বললে, আজকে ঘুমিও না, বুঝলে?

—আচ্ছা।

—দরজা খুলেই রাখ তো?

—রাখি।

আবার মাথার চুলে মৃদু স্পর্শ···শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ···দ্বারের শিকলটী একবার নড়ে উঠলো···বুঝলাম, ও চলে গেল, সেই চিরঅভিসারিকা···চরণে মঞ্জীর নাই···

জীবনে যে এত আনন্দও আছে এ আমি কোনদিন ভাবিনি মৃণাল। আমি শুধু আলোর শিখার মতো কাঁপতে লাগলাম।

অজয় ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলে।

আমি জিগ্যেস করলাম, সে কি রাত্রে এসেছিল?

—এসেছিল। কিন্তু আমি যেমন ক'রে চেয়েছিলাম, তেমন ক'রে তো এলো না। আমি একবার অত্যন্ত ঝড়ের রাত্রে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। তার পরণে ছিল রক্তের মত টকটকে লাল একখানা শাড়ী। তাই আড়াল দিয়ে সে একটি প্রদীপ বুকের মধ্যে নিয়ে অতি সন্তর্পণে আসছিল। কিন্তু ওতো তেমন ক'রে এলো না।

ও এলো কখন ? ওর প্রতীক্ষায় চেয়ে চেয়ে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছি তখন। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি, সাপের মতো ও যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে জড়িয়ে বেষ্টন ক'রে আছে। কী উষ্ণ স্পর্শ! বললাম, জানালাটা ভালো ক'রে খুলে দেবে ? আমি তখন উঠে বসেছি। বিছানার উপর অনেকখানি চাঁদের আলো এসে পড়লো। সেই আলোতে আমি ওর বুভুক্ষু চোখের পানে চাইতেই চোখ নামিয়ে নিলে। ও যেন বিষ খেয়েছে এমনি ক'রে আমার কোলের উপর ঢলে পড়লো।

একটু দম নিয়ে অজয় বললে, আমার আজও সংশয় যায়নি মৃণাল, আমার মধ্যে ও কি পেয়েছিল যার জন্যে এমন ক'রে আত্মসমর্পণ করেছিল? কথাটা একদিন ওকে জিগ্যেসও করেছিলাম। ও সোজা উত্তর দেয়নি, বলেছিল, আমিও তো সুন্দরী নই, তবু তুমি কি ক'রে ভালোবাসতে পারলে ? আমি বলেছিলাম, আমি তোমায় ভালোবাসিনি। সে কথায় ও হেসেছিল, বিশ্বাস করেনি।

আমি অজয়কে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু তুমি তো ওকে সত্যিই ভালোবেসেছিলে ?

অজয় চট ক'রে উত্তর দিতে পারলে না। যেন মনে মনে কি একটা খুঁজতে লাগলো। তারপর বললে, দেখ মৃণাল, ও যে আমার জীবনে একটী বিশেষ মুহূর্ত্ত এনেছিল, সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। কিন্তু তারপরে কি করলে জানো ? কিছুতে আমার সঙ্গ ছাড়ে না। বিকেলে হয়তো একা একাই বাগানে বেড়াচ্ছি, ও হঠাৎ এসে উপস্থিত। কথা দিয়ে, হাসি দিয়ে, চাউনি দিয়ে, আমাকে জয় করবার সে কী দুরন্ত চেষ্টা! শেষে এমন হ'ল যে, ওকে দেখলে আমি অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে উঠতে লাগলাম। ঘরে একা একটু বিশ্রাম করবার উপায় নেই, চিলের মতো শোঁ ক'রে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাগানে বেড়ানোর উপায় নেই। এমন কি

যমুনায় স্নান করতে গিয়ে দেখি, কলসী কাঁখে নিয়ে ও কখন এসে উপস্থিত হয়েছে। আমার উপেক্ষা ওর বুঝতে দেরী হয়নি। একদিন হঠাৎ এসে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে বললে, তুমি আমাকে দেখে অমন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িও না। আমি মনে করি, তোমার কাছে আসব না। কিন্তু পারি না, কিছুতেই মনকে আটকাতে পারি না। তার সে কী কান্না!

এমন সময় টুলু চা আর খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। একটা টিপয়ের উপর সেগুলো রাখতে রাখতে বললে, কার দাদা?

অজয় আবার চোখ বন্ধ করলে। তার গাল বেয়ে হু'ফোঁটা অশ্রু নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়লো। একটুখানি থেমে সে বললে, আমার ভয়ানক কষ্ট হ'ল। ওর মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, আমি যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, সে-কথা তোমায় কে বললে? ও বললে, আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিও না। আমি সব বুঝতে পারি। আমার কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমার বলবার কিই-বা ছিল? চুপ ক'রে বসে রইলাম।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অজয় ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, একদিন একটি বিশেষ ক্ষণে যে আমাকে অসীম আনন্দ দিলে, কি ক'রে সে ফুরিয়ে গেল বলতে পারো? ওকে আমি কেন সইতে পারতাম না, বলতো?

এ-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য। সুতরাং চুপ ক'রে রইলাম। টুলুর পানে চেয়ে দেখি, সে মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

বললে, আমি বলবো?

—বল্ তো।

—তোমার রাধা একটি সাধারণ মেয়ে। তোমার মন যাদের ঘিরে তরঙ্গ তোলে ও তাদের বাইরে। কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষণে তোমার মনে জোয়ার এসেছিল। তোমার তরঙ্গের পরিধি গিয়েছিল

বেড়ে। সেই ক্ষণটিতে তোমার চোখে ও যে, অসাধারণ হ'য়ে ফুটে উঠেছিল, সে ওর গুণে নয়, তোমার গুণে।

আমার দিকে চেয়ে অজয় জিগ্যেস করলে, তাই ?

এ বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই! সুতরাং চুপ ক'রে রইলাম।

অজয় বলতে লাগল, দেহ, দেহ, দেহ। কেবল একখানি দেহ এবং একটি পিপাসার্ত্ত হৃদয়! তুই বোধ হয় ঠিকই বলেছিস টুলু, আমাকে ক্লান্ত করেছিল ওর অতি সাধারণ পিপাসা, ওর অতি সাধারণ পিপাসা। কিন্তু—অজয় টুলুর দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বললে,—আচ্ছা ওকে আসতে লিখলে কি ও আসবে না? তুই কি মনে করিস ?

—ওকে আসতে লিখে দিয়েছি যে।

—দিয়েছিস? বেশ করেছিস। কিন্তু—অজয় খুব অস্ফুটস্বরে বললে,—কিছু টাকাও বোধ করি···

—তাও পাঠিয়ে দিয়েছি।

টুলু মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিল।

অজয় বললে, দেখতে ইচ্ছা হয় বইকি! আর ক'টা দিনই বা আছে? জীবনের পথে যাদের পেয়েছি সবাইকে মৃত্যুশয্যার পাশে জড় করতে ইচ্ছা হয়।

রাধাকে দেখলাম। একখানি শাদা সরুপাড় ধুতি প'রে প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে সে এসে পৌঁছুল। নিতান্ত সাধারণ মেয়েই বটে। চোখে মুখে বুদ্ধির এতটুকু দীপ্তি নেই। শহরের বিরুদ্ধে আবেষ্টনের মধ্যে এসে আরও যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। বড় বাড়ী এবং অপর্য্যাপ্ত বিলাসোপকরণের সঙ্গে তার যে কখনও পরিচয় ছিল এ কথা মনেই হয় না, এমন কুণ্ঠিত ব্যবহার। সত্যি বলতে কি, ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই তাকে মনে হল না। টুলুর হাসির মানে বোঝা গেল।

রাধা সঙ্কোচে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। টুলু বললে, দাদা, রাধা এসেছে যে!

রাধা কাছে সরে এল।

অজয় একবার চোখ চাইলে। শুধু একবার। তারপর চোখ বন্ধ করলে।

অজয়ের সে চাওয়া আমি আজও ভুলতে পারিনি,—যেন অস্তরবি চাঁদের দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দিলে।

জীবনের পথে চলেছিলাম হাল্‌কা পায়ে। হঠাৎ এ কী বাধা! আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত!

অজয়ের শেষকৃত্য সেরে যখন ফিরে এলাম তখন রাত হ'য়েছে, কিন্তু বেশী নয়। বোধ হয় ন'টা কি দশটা। সমস্ত বাড়ীটা যেন অন্ধকারে মুহ্যমান হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাতে আর জীবনের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। শ্মশান-বন্ধুরা যখন দ্বারপ্রান্তে এসে "হরিবোল" দিলে, বাড়ীখানা যেন শিউরে উঠল! কয়েক সেকেণ্ড পরে একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠল। সিঁড়িতে কার যেন অতি সন্তর্পণে নামার শব্দ পাওয়া গেল তারপরে নীচে একটি আলো জ্বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল।

রাধা নতনেত্রে একপাশে দাঁড়িয়ে। স্বল্প অবগুণ্ঠনের ফাঁকে সুন্দর মুখখানিতে একটি বিষণ্ণ ম্লানিমা। রাধা নীরবে আমায় টুলুর ঘরে নিয়ে গেল। আলো জ্বেলে অত্যন্ত সন্তর্পণে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। মৃত্যুর মতো শীতল, কঠিন এবং ভয়ঙ্কর। টুলু তার খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে চুপে চুপে কাঁদছে। অবরুদ্ধ কান্নায় ওর শরীর ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, এখুনি বুঝি ভেঙে পড়বে। কিন্তু আমার মুখে বাক্য যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে। এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায় কথা বলাই যেন অসভ্যতা। আর কী কথাই বা বলব? কথা বলার আছে কী! বিশেষ টুলুকে। বেচারী সমস্ত অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এইখানে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় পেয়েছিল। শুধু আশ্রয় নয়, পেয়েছিল সহদরেরও অধিক স্নেহ, মেয়েমানুষের চরমতম দুঃখের দিনে যা সে আর কোথাও পায়নি।

কথাটা আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করতে পারিনি, আজও পারি না। বিশ্বাস করার মতো কথাও নয়। ওদের দু'জনকেই আমি ভালো জানি। বিনাদোষে সুকোমল যে টুলুকে ত্যাগ করতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। পক্ষান্তরে টুলু যে এমন কোনো অপরাধ করতে পারে তাও অবিশ্বাস্য।

সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। এদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ওদিকে কাশ্মীর ঘুরে ফির্‌তি মুখে এলাহাবাদে নামলাম দাদার ওখানে। সেখান থেকে আবার যখন গাড়ীতে চাপলাম তখন অনেকগুলো বোঝা জমে উঠল। সেগুলো বর্দ্ধমানে নেমে বৌদির কাছে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে। ঠিক শহরে নয়, গ্রামে। সেই গ্রামেই টুলুর বাপের বাড়ী। সেইখানে প্রথম কথাটা শুনলাম।

বৌদি বললেন, এক বছর হ'ল টুলু বাপের বাড়ী এসেছে, এর মধ্যে সুকোমল একটি দিনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

কৌতুক ক'রে বললাম, এক বছরের মধ্যে দাদাও তো একটি দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তা থেকে কি প্রমাণ হয় যে···

বৌদি হেসে বললেন, আহা! তোমার দাদা যে এলাহাবাদে থাকেন, বছরে একবারের বেশী আসার উপায় নেই। সুকোমলবাবুর তো তা নয়। এখান থেকে কল্‌কাতা তো মোটে চার ঘণ্টার পথ।

বৌদির কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, তা অমন হয়। কাজের ভিড়ে আসতে পারেনি বোধ হয়।

বৌদি বাধা দিয়ে বললেন, তা যেন মানলাম। কিন্তু কাজের ভিড়ে কি একখানা চিঠি লেখারও সময় পান না?

তাও বটে! কিন্তু সুকোমল....

টুলুর জন্যে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হ'লাম। উদ্বেগের আরও কারণ ছিল। অজয় আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আত্মীয়। টুলু আমাদের বাড়ীর মেয়ের মতো। এই শিক্ষিতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়েটি বরাবরই আমার

বিশেষ স্নেহের পাত্রী। তার বিবাহের ঘটকও আমি। সুকোমল আমার কলেজের সহপাঠী এবং বিশেষ বন্ধু। অত্যন্ত শান্ত, মার্জ্জিতরুচি এবং চরিত্রবান। আমি তাকে ভালো ক'রে জানতাম ব'লেই টুলুকে নিঃসংশয়ে তার হাতে সমর্পণ ক'রেছিলাম। টুলুর সম্পর্কে সেজন্যে আমার একটা দায়িত্ব আছে।

বৌদি বললেন, প্রথমটা আমরাও কেউ সন্দেহ করিনি। তারপরে একমাস গেল, দু'মাস গেল, ছ'মাস গেল। না এল একখানা চিঠি, না এলেন তিনি নিজে। টুলু দিন দিন শুকিয়ে যায়। বাইরেও বেরোয় না, কারও সঙ্গে কথাও বলে না। তখনই ব্যাপারটা কানাকানি হ'ল।

বৌদির কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনলাম। টুলুর শুক্‌নো মুখখানি স্পষ্ট চোখের উপর ভেসে উঠল। বহুদিন তাকে দেখিনি। এতদিনে আরও অনেক বড় হয়েছে নিশ্চয়। সেদিনের চপল মেয়ের সুন্দর, স্নিগ্ধ মুখখানি এখন হয়তো মধুর গাম্ভীর্য্যে সুন্দরতর, স্নিগ্ধতর হয়েছে। মেঘে-ঢাকা চাঁদের মতো সেই মুখে আজ বিষণ্নতার ছায়া পড়েছে। হয়তো আরও রুগ্ন হয়েছে, চোখ ঢুকেছে কোটরে, দেহ আধখানা হ'য়ে গেছে। তা আর না হয়? স্বামীর ভালোবাসা হারালে মেয়েদের আর থাকে কি? বিশেষ এতবড় অপবাদে।

সেই কথাটাই বৌদিকে আর একবার জিগ্যেস করলাম। কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছুই জানেন না। শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর ক'রে মেয়েমানুষের এতবড় কলঙ্ক সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি বলতে চাইলেন না।

বললাম, কিন্তু আমি তো সুকোমলকে জানি। তার মন মেয়েমানুষের মনের মতো নরম। আমি তো জানি টুলু তার কাছে কতখানি। মিথ্যে নয়, সত্যি সন্দেহের বশেও টুলুকে ত্যাগ করা তার পক্ষে আত্মহত্যার চেয়েও কঠিন।

বৌদি দুষ্টুমি ক'রে বললেন, পুরুষ মানুষ বাড়াবাড়ি যতখানি করে, ততখানি ভালবাসে না। ভালোবাসা তাদের একটা নেশা। তাতে তারা মাতাল হয়। ভালোবাসা তাদের কাছে নিঃশ্বাসের মতো প্রয়োজনীয় নয়।

এই খোঁটা বৌদি পুরুষদের সম্বন্ধে যখন-তখন দেন। আমিও হেসে তাতে সায় দিই। কিন্তু আজ পারলাম না।

বললাম, সুকোমলের সম্বন্ধে ওকথা আপনি বলবেন না বৌদি। টুলুর জন্যে ও যে বাড়ী-ঘর সর্ব্বস্ব ছেড়েছিল। সে কথা ভুলতে চাইবেন না। টুলুকে আনন্দে রাখবার জন্যে ও কী না ক'রেছে!

বৌদি এবার জোরে জোরেই হেসে ফেললেন। বললেন, তাই তো বলছি গো, নেশা। যেই ছুটেছে অমনি নেশার বস্তুকে দু'পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

বৌদি আমাকে ভাববার অবকাশ দিয়ে চ'লে গেলেন।

একদিনের কথা মনে পড়ল :

আমাদের পড়া তখন শেষ হ'য়ে গেছে। সুকোমলের ভাগ্য ভালো, পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভালো চাকরী জুটে যায়। একদিন সন্ধ্যার সময় সুকোমল এসে উপস্থিত।

তার ভাবভঙ্গি দেখে বিস্মিতভাবে বললাম, সুকোমল যে! ব্যাপার কি?

—ব্যাপার আছে। টুলুকে এখানে নিয়ে এসেছি।

—সে কি! কবে আনলে?

—ঘণ্টাকয়েক হ'ল। হোটেলে উঠেছি এখন একটা বাসা দরকার।

এত তাড়াতাড়ি টুলুকে ক'লকাতা আনার সংবাদে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলাম। বললাম, কি ব্যাপার বলতো? অসুখ-বিসুখ নয় তো কিছু? বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুকোমল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলে। বললে, টুলুকে

বাড়ীতে রাখা চলল না। তোমার কাছে গোপন ক'রে লাভ নেই, শনিবারে-শনিবারে বাড়ী যাই। কিন্তু সপ্তাহের বাকী পাঁচটা দিনও ওকে ছেড়ে থাকা আমার অসম্ভব। বাসা আমাকে করতেই হ'ত। তবে এমন ক'রে নয়।

চেয়ারটা আমার আরও কাছে সরিয়ে এনে সুকোমল বললে, কিন্তু মায়ের অত্যাচার ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। টুলুকে ওখানে আর একটি দিনও রাখা চলল না।

আমি জানতাম, সুকোমলের মা অত্যন্ত কোপন স্বভাবের। স্নেহ মায়া, মমতা তাঁর কারও চেয়ে কম তা নয়। দীর্ঘকাল বহু দুঃখ স'য়ে কেমন একরোখা হ'য়ে পড়েছিলেন। রাগলে আর জ্ঞান থাকত না। কেঁদে-কেটে, চীৎকার ক'রে অভিসম্পাত দিয়ে পাড়া মাথায় করতেন। সুকোমল তাঁর একমাত্র সন্তান। তারও নিস্তার ছিল না। টুল বাড়ীতে থাকলে সে যে ঘন ঘন বাড়ী যায় এ তিনি পছন্দ করতেন না। এর মধ্যে পুত্রবধুর প্রতি ঈর্ষা ছিল কিনা কে জানে? থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুখে বলতেন অন্য কথা। বলতেন বেটাছেলে দিন-রাত্রি বউএর আঁচলে-আঁচলে ঘুরবে নাকি? অথচ তাঁর নিজের স্বামী যে তাঁর কথায় উঠতেন বসতেন, সেজন্য কোনোদিন কেউ তাঁকে প্রতিবাদ করতে শোনে নি। এইটুকুই আশ্চর্য্য!

সুকোমল বাড়ী গেলেই তিনি মুখ অন্ধকার করতেন। সুকোমল তা জানত। কিন্তু নিজেকে সংযত করা তার পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। অবশ্য যে ক'দিন সে থাকত, তার মা মুখ বুজেই চলতেন! সে চলে এলেই বাক্যবাণ বর্ষণ আরম্ভ হ'ত। তার আর বিরাম ছিল না।

একথা আমি জানতাম। এবং সুকোমল ও টুলু দু'জনকে বহুবার সাবধানও করেছি যে, মায়ের ঈর্ষায় ইন্ধন যোগান দু'জনের পক্ষে কখনই সুখকর হবে না। তারা নিঃশব্দে আমার উপদেশ গ্রহণ করেছিল। ভেবেছিলাম, গোলযোগের শেষ হ'ল। সুকোমল বাসা করছে শুনে বুঝলাম আমার উপদেশ বৃথা গেছে।

দোষ যারই হোক, টুলু নিজেও যে আর শাশুড়ীর বাক্যজ্বালা সইতে পারছিল না, এ বিষয়ে ভুল নেই। শুধু তাই নয়, শাশুড়ীর প্রত্যেকটি কথা কখনও মুখে, কখনও পত্রযোগে স্বামীর কানে পৌঁছেও দিয়েছে। মানুষ রাগের মাথায় কি না বলে! বিশেষ সুকোমলের মায়ের মতো লোক। সুতরাং সকল কথা যখন সুকোমলের কাছে পৌঁছয়, অনেকখানি বিষ ছড়িয়ে দেয়।

ভাবছিলাম, সেই সুকোমল টুলুকে ত্যাগ ক'রেছে। সপ্তাহে পাঁচটা দিনও যার পক্ষে ছেড়ে থাকা অসম্ভব ছিল, সে যদি টুলুকে ত্যাগ ক'রে থাকে, তাহ'লে পৃথিবীতে অসম্ভব ব'লে আর রইল কি!

বৌদি এসে আমার ধ্যান ভাঙিয়ে দিলেন। জিগ্যেস করলেন, কি ভাবছ?

ম্লানভাবে একটু হাসলাম। বললাম্, ভাবছি অনেক পুরোনো একটা কথা।

আমার কেমন মনে হচ্ছিল, টুলু এখনই আসবে। আমার সঙ্গে অজয়ের এবং সুকোমলের কত নিবিড় সম্বন্ধ তা সে জানে। তার নিজের প্রতিও আমার স্নেহ কম নয়। এই দুঃখের দিনে যদি কাউকে সমস্ত কথা জানাতে পারে, সে আমি। হয়তো কবে আমি আসব এই ভেবেই সে দিন গুনেছে। তারই প্রতীক্ষায় ব'সে রইলাম। কিন্তু সমস্ত সকালের মধ্যে সে এল না। বৌদিকে জিগ্যেস করলাম, আমি কবে আসব একথা টুলু কোনোদিন জিগ্যেস করেনি?

বৌদি ঘাড় নেড়ে বললেন, এ-বাড়ীতেই সে বহুদিন আসেনি! সে কোথাও বের হয় না।

ভাবলাম, এমনও হ'তে পারে যে টুলু আমার আসার সংবাদই জানে না। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই তো তার ছোট ভাইটি একটি রবারের বল না কি খুঁজতে এ-বাড়ীর মধ্যে এসেছিল। আমাকে

দেখে একটা প্রণামও ক'রে গেল। সে কি বাড়ীতে এ সংবাদ দেয় নি? কি জানি!

দুপুরও গেল। বিকেলের দিকে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভাবলাম, এবার টুলুর না হোক, তার বাড়ীর খবরটাও নিয়ে আসা যাক।

টুলু ঘরের ভেতর কি একটা করছিল। আমার ডাক শুনে বাইরে এসে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অবাকও নয়, কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

জিগ্যেস করলাম, মা কোথায়?

—ঘাটে গেছেন। এখনি আসবেন।

বসব কি না ভাবছিলাম। টুলু হয়তো সেকথা বুঝতে পারলে। বললে, বসবেন?

টুলু দাওয়ায় একটা আসন পেতে দিলে। জিগ্যেস করলে, কাল রাত্রে এসেছেন?

—কাল রাত্রে।

—ভালো ছিলেন?

—আছি একরকম। তুমি কেমন আছ?

টুলু একটু হাসলে। শীতের সকাল বেলায় মেঘ-ভাঙা এক টুকরা রোদের মতো। বললে, আজকালকার দিনে ভালো থাকা কত কঠিন জানেন তো?

টুলু যেন আমার কথা বলার পথ পরিষ্কার করে দিলে। তবু কথাটা উত্থাপন করতে বাধছিল। একটা ঢোক গিলে জিগ্যেস করলাম, সুকোমলের খবর কি? ভালো তো?

টুলু হঠাৎ মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগলো। বললে, জানি না।

টুলুর হাসি আর বন্ধ হয় না। আশ্চর্য্য মেয়ে! আমার সন্দেহ

হল বৌদির কথা বুঝি তবে সত্যি নয়। তবু জিগ্যেস করলাম, এর মধ্যে আসে নি? চিঠি পেয়েছ?

এবারে টুলু এমন জোরে হেসে উঠল যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম।

টুলু বললে, কেন মিথ্যে না-জানার ভান ক'রছেন? আমার ভাগ্যের কথা কে না শুনেছে?

ওর কথায় আমি অপ্রতিভ হ'লাম। বললাম, আমি সবই শুনেছি টুলু। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—

টুলু চুপ করে রইল।

বললাম, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, সুকোমলের দ্বারা এ কাজ সম্ভব।

টুলু এক মুহূর্ত্ত চোখ মেলে আমার দিকে চাইলে। বললে, বিশ্বাস আমারও হয়নি মৃণালবাবু। আমিও রাগের মাথায় চলে এসেছিলাম। মনে মনে জানতাম, একদিন সাধ্যসাধনা ক'রে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ পাবে না।

টুলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। দেখতে দেখতে কোথায় গেল মুখের হাসি! চোখ বাষ্পসমাকুল হ'য়ে উঠল। আমার দিকে চোখ তুলে আর চাইতে পারে না।

বললাম, হঠাৎ তার মতিগতি এমন হ'য়ে গেল? কী হয়েছিল?

—সে তাঁকেই জিগ্যেস করবেন। আমি কিছু জানি না।

টুলু উঠে পড়ল। তার ভঙ্গিমার দৃঢ়তায় বোঝা গেল, এ-প্রসঙ্গে আর বেশী কথা সে কইতে চায় না।

কিন্তু আমিও ছাড়লাম না। বললাম, বোসো। উঠলে হবে না। সুকোমলের ওপর অভিমান করবার তোমার অধিকার আছে সত্যি, কিন্তু এখন অভিমান ক'রে ব'সে থাকবার সময় নয়। আমাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। তার সঙ্গে আমাকেও বোঝাপড়া করতে হবে। তোমাদের দু'জনের সম্বন্ধেই আমার একটা দায়িত্ব আছে।

টুলু এক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বোধ করি আমার কথাটা মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে। তারপর সেইখানে মেঝের উপর ধুপ করে বসে উত্তেজিতভাবে বললে, কি ছাই বলব? এ কি বলবার মতো কথা মৃণালবাবু? আপনার বন্ধু আমাকে সন্দেহ করেন। আর শুনবেন?

টুলুর চোখ দিয়ে যেন এক ঝলক আগুন বের হয়ে এল।

বৌদিও আমাকে এমনি আভাসই দিয়েছিলেন। তথাপি একথা এত স্পষ্ট ক'রে শুনে আমার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। যে-কেউ টুলুকে বিন্দুমাত্রও জানে সে-ই একথা শুনে বিস্মিত হবে। আমি তার মুখের দিকে নির্ব্বাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

মিনিট দুই এমনি কাটল।

ধীরে ধীরে বললাম, এতদিন একত্রবাসের পরেও তোমাকে সন্দেহ করলে? সুকোমল?

এত দুঃখেও ফিক ক'রে হেসে টুলু মুখে আঁচল চাপা দিলে। বললে, দেখুন তো মৃণালবাবু! বুড়ো বয়সে এ আবার কি রোগে ধরলে!

রোগই বটে! এতদিন একসঙ্গে কাটিয়েও যদি দু'টি নরনারী পরস্পরের মন জানতে না পারে, আর কবে পারবে! স্বামীর প্রতি টুলুর শ্রদ্ধা যে কত বেশী একথা কিছু-না-হ'লেও একশোবার আমি সুকোমলের কাছেই শুনেছি। তারপরেও সেই সুকোমল যদি স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়, তাকে রোগ বলব না তো কি বলব!

জিগ্যেস করলাম, এদানি কি তোমাদের বনিবনাও হ'ত না? খুব কি ঝগড়া ঝাঁটি হ'ত?

টুলু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, একদিনও না। আপনি তো ওঁকে জানেন, উনি কি ঝগড়া করার লোক? দোষ আমারই।

আমি যদি একটু সাবধান হ'তাম, এ অনর্থঘটত না। আপনাকে সব কথাই বলি ঃ

একটু সজ্জলভাবে হেসে টুলু বলতে লাগল ঃ

অজয়দার দেখাদেখি একটু কবিতা লেখার সখ আমার হ'য়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতাম। একদিন সেই খাতা ওঁর চোখে পড়ল। আমি জানি, সে সব কবিতা হয়তো কিছুই নয়। তবু তাই পড়েই ওঁর কি আনন্দ।

টুলুর চোখে সেদিনের সুখ-স্মৃতি বোধ হয় একবার ভেসে উঠল ; একটুখানির জন্যে সে উন্মনা হ'য়ে পড়ল।

তারপর বলতে লাগল, আমার অদৃষ্টে সেই হ'ল কাল। কাজকর্ম্ম সব গেল চুলোয়, শুধু কবিতার পর কবিতা লিখি। আগে বিকেলের জল খাবার আমি নিজের হাতে তৈরী করতাম। ক্রমে সে ভার পড়ল ঠাকুরের হাতে। আমি কেবল কবিতা লিখি। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, মাসিকপত্রে পাঠালে হয় না? তাই পাঠালাম! কিন্তু কাউকে বললাম না। ভাবলাম যদি ফেরত আসে, জানিয়ে আর লজ্জা বাড়াই কেন? বরং যদি ছাপা হয় সবাইকে তাক লাগিয়ে দোব। কিন্তু তাক লাগান আর হল না। লেখা ফেরত এল। আর পড়বি তো পড় ওঁরই হাতে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। কিন্তু উনিও কিছু বললেন না, আমিও না। আপনি পান খাবেন মৃণালবাবু? আপনার আবার বেশী পান খাওয়ার অভ্যাস।

টুলু উঠতে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না থাক। পান আমার পকেটেই আছে। তুমি তারপর বলো।

টুলু হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বললে, আর শুনতে হবে না মৃণাল বাবু। এ শুনে কারও কোনো লাভ নেই।

আরম্ভেই কথা বন্ধ করায় আমি চটে গেলাম। বললাম, আছে লাভ। তুমি বলো।

টুলু আর আপত্তি করলে না। বললে, আমি কিন্তু দমলাম না। নানা কাগজে নানা লেখা পাঠাতে লাগলাম। সব কবিতাই সব জায়গা থেকে যথা সময়ে ফেরত এল। কেবল একখানি বড় কাগজ একটি লেখা ছাপলে এবং তার সম্পাদক মশাই কবিতাটির প্রশংসা করে একখানা চিঠিও দিলেন। সে চিঠি উনি দেখেছেন কি না জানি না। কিন্তু আমি আর দেখালাম না। ভাবলাম, লেখাটা নিজের চোখে ছাপার অক্ষরে না দেখলে আর কারও কাছে ভাঙচি না। অবশেষে লেখাটা বের হল।

সে কবিতা আমিও দেখেছি। বললাম, ওহো, সেটা তোমারই লেখা? 'বন্দীর ব্যথা'? সে তো আমিও দেখেছি। স্বামীর গৃহে মেয়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশা নিয়ে লেখা।

আনন্দে ও গর্ব্বে টুলু মুখ নত করলে।

বললে, সেই হল কাল। লেখাটা নিজে থেকে ওঁকে দেখাতে লজ্জা করছিল। ওঁর টেবিলে কাগজখানা রেখে দিই, যেন ভুলে রেখেছি। উনি দু'তিনবার কাগজখানার দিকে চাইলেন টের পেলাম। কিন্তু সে আর বাঁ হাত দিয়েও ছুঁলেন না। সে রাত্রে কেবলই গল্প করতে লাগলেন, কজন সম্পাদকের সঙ্গে কজন লেখিকার বিবাহ হয়েছে। আর যে-ক্ষেত্রে লেখিকা বিবাহিতা সে-ক্ষেত্রে কি অঘটন ঘটেছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম এসবই তাঁর বানানো গল্প। কোন সম্পাদকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় নেই! কোনো লেখিকার কথাও জানেন না। আপিসে বসে হিসেবের খাতা নিয়ে পরের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব রাখা ছাড়া কিছুই তিনি করেনও না, জানেনও না। ওর কথা শুনে একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা কেঁপে উঠল। সেই সঙ্গে রাগও হল। মনে হল পুরুষ মানুষ শুধু মেয়েদের দেহ পর্দ্দানশীন করেই তৃপ্ত নয়, তাদের মনকেও পর্দ্দানশীন করতে চায়।

আমি হেসে ফেললাম।

—সর্ব্বনাশ! তোমারও দেখছি স্ত্রী-স্বাধীনতার হাওয়া লাগল।

আমার পানে বড় বড় চোখ মেলে টুলু গম্ভীরভাবে বললে, হাসবেন না মৃণালবাবু। অধিকাংশ পুরুষের পক্ষেই যে একথা সত্যি এ আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে জেনে গেলাম।

টুলুর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল।

ঈশানকোণে একটুক্‌রো মেঘ ধীরে ধীরে কালো হ'য়ে উঠেছিল নির্নিমেষে সেইদিকে চেয়ে রইল।

তারপর বললে, তখন যদি বুঝতে পারি ওঁর মনে পাপ ঢুকেছে তাহ'লে কি আর এ দুর্ভোগ ঘটে! অতটা আমি ভাবতেই পারিনি। যেমন কবিতা পাঠাচ্ছিলাম, তেমনি পাঠাতে লাগলাম। সম্পাদকের সঙ্গে পত্র-বিনিময়ও বন্ধ করলাম না। বরং ধীরে ধীরে পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠল,—একটুখানি আত্মীয়তাও। সে সব চিঠি উনি পড়েছেন কিনা জানি না। হয়তো পড়েননি, মাঝে মাঝে খামটুকুই দেখেছেন। কিংবা যদি পড়ে থাকেন তো লুকিয়ে। তখন আমাদের সম্বন্ধ কেমন দাঁড়ালো জানেন? কলহ নয়, কথা বন্ধও নয়। কারণ ঘট্‌লে পরস্পরের কথায় পরস্পরে হেসেও ফেলি। কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা ফাঁক থেকে যায়। আমার কাছে একলা বসলে উনি যেন অস্বস্তি বোধ করেন এবং আমিও কেমন কুণ্ঠিত হই। হয় দু'জনে দু'খানা বই নিয়ে বসি, নয় উনি চাকরটাকে তামাক দিতে বলেন আর আমি চাকরটা তামাক দিচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে সেই যে বাইরে আসি আর ভিতরে যেতে পারি না। এমনি করে ওঁর দিন হয়তো কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি আর পারছিলাম না। একটা কথা বিশ্বাস করুন মৃণালবাবু, উনি যদি আমাকে ত্যাগ না করতেন আমাকে আত্মহত্যা করতে হ'ত। ঐ গুমোট আমি আর সইতে পারছিলাম না।

টুলুর বুকের ওপর কে যেন একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারছিল না।

দেখতে দেখতে ঈশান কোণের মেঘ বেশ কালো হ'য়ে উঠলো। ঝড় ওঠেনি, কিন্তু গাছপালাগুলি যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঝড়েরই প্রতীক্ষা করছিল। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে আমি টুলুর পানে চাইলাম।

টুলু বলতে লাগলো, একটা ঝগড়া হওয়া দরকার,—তুমুল ঝগড়া। যেদিক দিয়ে হোক একটা শেষ না হ'লে আমি বাঁচব না, এমনি আমার মনের অবস্থা। একদিন উনি অফিস থেকে ফিরতেই বললাম, এত দেরী হ'ল যে!

একে তো ওঁর দেরী হয়নি, তার ওপর এমন প্রশ্ন অনেকদিন করিনি। জামা ছাড়তে ছাড়তেই উনি বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, কেন বলো তো? কিছু দরকার ছিল?

প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, ছিলই তো! আমাকে যে এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

—কোথায় বলতো?—উনি ক্রমেই বিস্মিত হচ্ছিলেন।

—একটা সাহিত্য-সভায়। নিমন্ত্রণ এসেছে।

আমি দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলাম, এইবার ওঁর মুখ থেকে একটা কড়া কথা নিশ্চয় বেরুবে। তখন আমিও···

ও হরি, একটা কড়া কথাও তিনি বললেন না! জামাটা খুলে আল্‌নায় রেখে বললেন, তবেই তো মুস্কিলে ফেললে। আমাকে যে এক্ষুণি বেরুতে হবে। না বেরুলেই নয়।

আমি আরও একটু চাপ দিলাম। বললাম, তাহলে আমি একাই ঘুরে আসি। কি বল?

—বেশতো!—বলেই চলে গেলেন।

উনি তো চলে গেলেন, কিন্তু আমি যাই কোথায়! সত্যিই তো আর কোথাও নিমন্ত্রণ ছিল না। তবু বেরুতে হ'ল। একখানা গাড়ী ক'রে অনাবশ্যক খানিকটা ঘুরে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন

রাত ন'টার কম নয়। ওঁকে দেখলাম না। শোবার ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়ে নজরে পড়লো টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি,—ওঁরই হাতের লেখা। তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে চিঠিখানা খুলতেই পড়লাম ঃ

টুলু,

তোমার বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিলাম। কাল সকালের গাড়ীতেই কেউ আসবেন আশা করা যায়। তাঁর সঙ্গেই তুমি চলে যেও। তুমি গেছ খবর পেলেই আমি বাড়ী ফিরবো। ইতি—

সুকোমল

আমার কি হয়েছিল জানি না, যখন জ্ঞান হ'ল তখন সকাল হয়েছে। আমি সেই চেয়ারেই বসে। সেই পোষাকে।

আকুল ক'রে মেঘ এলো। এখুনি ঝড় উঠবে। এইবার উঠতে হয়।

টুলুর কথায় আমার মন ভারী হ'য়ে উঠল। তথাপি তরলকণ্ঠে বললাম, এখন উঠলাম টুলু। কাল কল্‌কাতা যাচ্ছি। সেই রাসকেলটাকে ধরে এনে পরশু তোমার কাছে হাজির করব নিশ্চয়।

আমার সঙ্গে সঙ্গে টুলুও উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথা শোনামাত্র সে খপ্ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, ঐ কাজটি করতে পাবেন না মৃণালবাবু। লোককে ভূতে পায়, ওঁকে পেয়েছে সন্দেহে। মানুষের সাধ্য নেই তার হাত থেকে ওঁকে নিস্কৃতি দেয়।

—তুমি দেখোতো!

—না, না, না। আমি দেখতে চাই না। ওঁকে আপনি আমার চেয়ে বেশী চেনেন? আমি এখানে যে কষ্ট পাচ্ছি, তার চেয়ে ঢের বেশী উনি সেখানে বসে ভোগ করছেন। সন্দেহের বিষ কীটের

মত ওঁর সমস্ত মন কুরে কুরে খাচ্ছে। উনি আমার চেয়েও অসহায়। কি হবে গিয়ে?

কোথা হ'তে ধুলো-বালি শুক্‌নো পাতা উড়ে এসে উঠান অন্ধকার ক'রে দিলে। ঝড় এসে পড়েছে। কাল বৈশাখীর ঝড়? সেই মুহূর্ত্তেই টুলুর মা ভিজা কাপড়ে একটা পিতলের ঘড়া কাঁখে ক'রে খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকলেন। টুলু তখনও আমার হাতখানা ধ'রে ছিল।

টুলুর মা দরজার গোড়াতেই আমাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন। আর টুলু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার হাত ছেড়ে দিলে।

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে টুলুর মার পায়ের ধুলো নিলাম। কিন্তু আমাকে চেনবার পরেও তাঁর মুখ খুব প্রসন্ন হ'ল বলে মনে হ'ল না।

—খুড়িমা, ভালো আছেন?

প্রত্যুত্তরে কি বললেন বোঝা গেল না। সোজা ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

ওদিকে চেয়ে দেখি টুলুও অকস্মাৎ কখন সরে পড়েছে।

অর্থ বুঝলাম না। তবু একটা লজ্জাকর আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। স্তব্ধভাবে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম।

কল্‌কাতায় ফিরে সেই রাস্‌কেলটার সঙ্গে আর দেখা করি নি। করার ইচ্ছাও হয় নি। শুধু সুকোমলই তো নয়, আজ পৃথিবী শুদ্ধ লোকের সন্দেহ পড়েছে ওর উপর। কেউ কিছু জানে না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করেও দেখবে না। অকারণে কেবল ওকে সন্দেহই করবে।

এসে অজয়কে সমস্ত বললাম। তখনও সে এমন শয্যাগত হয় নি। তার চোখ কালো চশমায় ঢাকা ছিল;—দেখা যাচ্ছিল না। শুধু কুঞ্চিত রোগগ্রস্ত গালের উপর দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

টুলুকে ও নিজের হাতে মানুষ করেছে। টুলু ওর শিষ্যা। কিন্তু তাও নয়। অজয় চিররুগ্ন ; এবং বোধ হয় সেই জন্যেই মেয়েদের সম্বন্ধে চিরকাল chivalrous. ওর দুঃখ শুধু টুলুর জন্যে নয়, কোনো একটি মেয়ের জন্যে নয়। সকল কালের, সকল দেশের লাঞ্ছিত এবং অপমানিত মেয়ের জন্যে। অজয় ওকে আদর ক'রে নিয়ে এসে সসম্মানে নিজের গৃহে প্রতিষ্ঠিত করলে।

ওর সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ কাটতে দেরী লেগেছিল। কিছুই নয়, কিন্তু ওর মায়ের বিরক্ত সন্দিগ্ধ চাহনি, টুলুর ত্রস্তভাবে পলায়ন, সে আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি। সন্দেহ শুধু সন্দেহপরায়ণকেই নীচু করে না, সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মনেও গ্লানি জমায়। সেই গ্লানি পরিষ্কার হ'তে সময় নিয়েছিল। তারপর এসব কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। তখন ভাবি নি যে, ভুলে ছিলাম অজয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যবর্ত্তিতায়। আজকে সে নেই। সমস্ত গ্লানি, সমস্ত লজ্জা আজ আবার নতুন করে ফিরে এলো।

ভাবনা হ'ল, এইবারে এদের নিয়ে করি কি! এত বড় বাড়ীতে দুটি মেয়ের পক্ষে আজ রাত্রে একলা থাকা অসম্ভব। অবশ্য আজ রাত্রের সমস্যার মীমাংসা কঠিন হবে না। তারপর রাধা না হয় বৃন্দাবনেই ফিরে গেল। সেইখানেই তো মানুষ। কিন্তু টুলু? টুলু যে অজয়ের ভরসায় সব আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসেছে! শ্বশুরালয়ে স্থান নেই, পিত্রালয়েও না। তবে ও যায় কোথায়? সদ্য বিয়োগ ব্যথায় এসব সমস্যা এখনও হয়তো ওর মনে ওঠে নি। কিন্তু কাল?

একটি মেয়ের ভরণ-পোষণের ভার নেওয়ার শক্তি যে আমার নেই তা নয়। সে ভয় করি না। কিন্তু ওকে রাখি কোথায়? এই বাড়িতে একলা ও থাকবে সে সম্ভব নয়। আমার বাড়ীতেও একটি স্ত্রীলোক নেই যে ওকে নিঃসঙ্কোচে নিয়ে গিয়ে রাখি। শঙ্কা

করার কারণ কিছু নেই। সমাজের সঙ্গে কোথাও আমার বাঁধন শক্ত নয়। প্রতিবেশীর মিথ্যে চোখ রাঙানোর ভয় আমি করব কেন?

কিন্তু শুধু আমার কথাই তো নয়, আরও একটা পক্ষ রয়েছে যে! আমি পুরুষ মানুষ। কলঙ্ক আমার হাঁটুর উপর উঠতে পারে না। কিন্তু সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এতটুকু অসম্মানের মধ্যে ওকে আমি ফেলি কি ক'রে? আমার পক্ষে যা কিছুই নয়, ওর পক্ষে তা যে বিষ! এক মুহূর্তে ওর সমস্ত অস্তিত্বকে দেবে কুৎসিত ক'রে। পৃথিবীতে মুখ দেখাবার কোনো উপায়ই রাখবে না। তবে টুলুর আজ আশ্রয় কোথায়?

আমি ওকে ছেলেবেলা থেকে জানি, চিনি, বুঝি! সবাই তো সে সুযোগ পায় নি। একজন মানুষ আর একজনের বিচার করার সময় যথেষ্ট চেনার অপেক্ষা রাখে না। বিচারের ফল যত গুরুই হোক বাইরে দেখেই সবাই বিচাব করে। বিশেষ, টুলুকে সন্দেহ করা—আমি ভেবে দেখেছি—অত্যন্ত সহজ। তার সম্বন্ধে অবিচার করা প্রায় স্বাভাবিক।

বাঙালীর মেয়ে সাধারণতঃ কাঁকণ এবং কণ্ঠহারের বেড়ির বাঁধনে ধীরে ধীরে বাড়ে। টুলু বাঁধন পায় নি ছেলেবেলায়। সে বেড়েছে তারই বয়সী ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সতেজে। ফলে, সে হ'য়েছে চপল, চটুল, বাচাল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে যে প্রচুর প্রাণশক্তি টুলু পেয়েছিল, অজয় তাকে খর্ব্ব করার, সংযত করার কোনো ব্যবস্থাই করে নি: ওর মাথা খেয়েছে অজয়।

অবশ্য অজয়ের দুঃখও আমি বুঝি। জন্মের সঙ্গে সে পেয়েছিল কুৎসিৎ, দুরারোগ্য ব্যাধি। এ তার পিতৃপুরুষের দান। তার চাপে বিধাতার দেওয়া প্রাণশক্তি শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। তাই প্রাণশক্তির ওপর তার শ্রদ্ধাও ছিল যেমন, লোভও ছিল তেমনি। কোনো সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার খাতিরেই সে কারও প্রাণশক্তি

ক্ষুণ্ণ করতে চাইত না। মনে করত পাপ। বলত, এ যারা করে তারা বিধাতার অভিশাপকে আহ্বান করে।

হয়তো করে। কিন্তু আজকে তার টুলু তো দাঁড়ালো পথে! তাকে সম্মানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে এমন বলিষ্ঠ বাহু আমি তো দেখি না। অজয়ের কথা স্বতন্ত্র। দুরারোগ্য ব্যাধি রাখবার মতো কোনো সম্পদই তার রাখে নি। কিন্তু তার বদলে দিয়েছিল একটা নিস্পৃহ বলিষ্ঠতা। একটা কিছুরই লোভে অন্য কিছুকে মেনে চলার প্রয়োজন গিয়েছিল ফুরিয়ে। ভরসা করার কিছুই যার নেই তার আর ভয় কিসের? কিন্তু আর সকলের তো তা নয়। প্রচলিত বিধি বিধান তাদের মেনে চলতে হবে। বিশেষ ক'রে মেয়েদের। সুনাম ছাড়া তাদের জীবনে আর আছে কী? কলঙ্কিনী হওয়া কি মুখের কথা?

সর্ব্বশেষ এবং একমাত্র আশ্রয় থেকে চ্যুত হ'য়ে টুলু একেবারে ভেঙে পড়েছে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। সান্ত্বনা দিতে যাওয়াই বর্ব্বরতা। তার চেয়ে ও একলা ব'সে ব'সে কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে নিজেকে হাল্কা ক'রে ফেলুক। তারপরে শক্ত তো ওকে হ'তেই হবে। কিম্বা পালকের মতো হাল্কা, যাতে আঘাত ওর গায়ে লাগবে না।

রাধাকে ডেকে বললাম, আজ রাত্তিরটা বোধ হয় আমাকে এইখানেই থাকতে হবে!

রাধা তড়াতাড়ি বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তাই আপনাকে বলব ভাবছিলাম।

বললাম, না, সে আমি আগেই স্থির ক'রেছি। নইলে তোমাদের···বলতে যাচ্ছিলাম, অসুবিধা হবে। কিন্তু রাধা অসঙ্কোচে বললে, ভয় তো হবেই। দু'টি মেয়েতে, এত বড় বাড়ীতে, তাতে···

তার নিঃসঙ্কোচ উক্তিতে আমি বিস্মিত হ'লাম। মনে হ'ল টুলু ঠিকই বলেছে। রাধা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে।

৩

পরের দিন ঘুম ভেঙ্গে যখন উঠলাম, তখন বেলা অনেক হয়েছে। কাল সমস্ত দিন ধ'রে মনে অবসাদ জমেছিল। তাও আর নেই। মুখ হাত ধুয়ে এসে বসতেই রাধা চা জলখাবার নিয়ে এল।

বললে, রাত্রে আপনার ঘুম ভালো হয়েছিল তো?

—ভালোই হ'য়েছিল। কিন্তু এসব আবার কেন, চা জলখাবার?

কুণ্ঠিতভাবে রাধা বললে, সকালে আপনি জলখাবার খান না?

—খাই। তবে—

যাক্ গে। রাধাকে ইঙ্গিতে বোঝানো অসম্ভব। জিগ্যেস করলাম, টুলু উঠেছে?

—উঠেছেন। কাল সমস্ত দিন তো জলবিন্দুও খান নি। জোর ক'রে মুখে কিছু দিয়ে এলাম। গুরুদেব বলতেন, চক্ষু বুজলেই সকলি অন্ধকার।

রাধা দোর গোড়াতেই ভক্তিযুক্ত হ'য়ে বসল। পরণে তার চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ী। মাথায় ভিজা এলোচুল পিঠের কাছে গেরো দেওয়া। টিকলো নাকটির উপর পরিপাটি করে সরু রসকলি এঁকেছে। মনে হয় একটু আগে পূজো সেরে উঠেছে। মুখে শিশুসুলভ অর্থহীন হাসি। ওকে দেখলে গত কালের ঘটনা ভুল হ'য়ে যায়। মুখে-চোখে শোক-দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই। দেখে আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

বললাম, চল, টুলুর ঘরে যাওয়া যাক।

—চলুন।

টুলু তখন খাটের বাজুতে মাথা রেখে চুপ ক'রে পড়েছিল। কাঁদছিল না, বোধ হয় কিছু ভাবছিল। আমার পায়ের শব্দে

প্রথমটা চমকে উঠল। বোধ হয় অন্যমনস্কতার জন্যে। তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, আসুন।

কেঁদে কেঁদে ওর চোখ জবাফুলের মতো লাল হ'য়েছে। আলুথালু বেশবাসে নিদারুণ শোকাবহতা। নিঃশব্দে একখানা চেয়ার টেনে বসলাম। কিছুই বললাম না। মনে হ'ল ওরই যেন কিছু বলার আছে; নীরবে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম অন্য দিকে চেয়ে।

অকস্মাৎ টুলু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলে অত্যন্ত শীর্ণ ম্লান এক টুকরো হাসি। সে হাসি যেন কালের স্রোতে অসহায়ভাবে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল। মনে হ'ল বলতে চাইলে, এইবার? এইবার কি?

রাধা ধীরে ধীরে ওর পিঠের কাছে ব'সে স্নেহভরে চুলের জট ছাড়াতে বসল।

টুলু বললে, আমি বড় ভাগ্যবতী, না মৃণালবাবু? যেখানে গেছি সেখানেই আগুন জ্বালিয়েছি। এর পর কার ঘাড়ে গিয়ে চাপি বলুন তো?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

টুলু আবার বললে, অজয়দার খুড়তুতো ভায়েরা এখনও খবর পান নি। দু'তিন দিনের ভেতর পেয়ে যাবেন নিশ্চয়। খবর পাওয়ার পর যে বাড়ী দখলের জন্যে তাঁরা বিলম্ব করবেন এমন মনে হয় না।

সে বিষয়ে আমিও নিঃসংশয়।

টুলু বলতে লাগল, এই দু'তিন দিন এখানে থাকা চলবে। তারপরে?

সংস্কারের চেয়ে করুণা আমার মনে প্রবল হ'য়ে উঠল। বললাম, তারপরেও তুমি জলে পড়বে না, টুলু। আমি তো রয়েছি।

টুলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ। সেই আমার শেষ ভরসা! কিন্তু সে কি আপনার সুবিধা হবে?

বললাম, আমার জন্যে ভেব না টুলু। আমার অসুবিধা কিছুই হবে না। কিন্তু তার আগে তোমার মাকে একখানা চিঠি দেওয়া দরকার।

টুলু চমকে বললে, কেন ?

বুঝিয়ে বললাম, তাঁর আশ্রয়ই তোমার পক্ষে সব চেয়ে নিরঙ্কুশ। রাগের মাথায় যাই তিনি ব'লে থাকুন, তিনি তো মা! কিছুতেই তোমাকে ফেলতে পারবেন না।

টুলু অবিশ্বাসের সঙ্গে হাসলে।

বললে, না। সেখানে কোন সুবিধার আশা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

টুলু রাধার হাত থেকে এলোচুলগুলো মুক্ত ক'রে নিয়ে আর একটু স'রে বসল।

বললাম, তবে আমার ওখানেই চল। সেখানে যাওয়ার জন্যে অনেক ক্ষতি অবশ্য তোমাকে সইতে হবে। জানোই তো, আমার বাড়ীতে আর স্ত্রীলোক কেউ নেই।

পায়ের আঙুলের নখ খুঁটতে খুটতে কথাটা সে ভালো ক'রে ভাবতে লাগল।

বললাম, অনেক সাহসের দরকার হবে।

ভাসা ভাসা নিস্পৃহ চোখ তুলে টুলু বললে, সাহস ছাড়া আর আমার কি রইল বলুন!

কিছুক্ষণ ওর চিন্তাক্লিষ্ট অবসন্ন মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, তবে তাই চল। আমি বলি, আজ বিকেলেই তো আর···

টুলু আগ্রহে বললে, বিকেলেই তো ভালো। এখানে আর এক দণ্ড থাকতে পারছি না।

বাধা দিয়ে বললাম, সে তো হয় না টুলু। এ বাড়ীর যাঁরা মালিক তাঁরা আসুন। সমস্ত বুঝে-সুঝে নিন। তারপরে।

টুলু বললে, তাঁরা যদি এখন না আসেন?

আমার ওকালতি করাও তো অনেকদিন হ'ল। প্রাপ্য সম্পত্তির দখল নিতে দেরী করে এমন বোকা বেশী নেই। হেসে বললাম, তা কি হয়। তাঁরা এলেন ব'লে! হয়তো আমরা যা ভাবছি তারও আগে এসে পড়বেন।

উদাসকণ্ঠে টুলু বললে, এলেই ভালো।

এ ব্যাপারের এইখানেই নিষ্পত্তি হ'ল। এবার রাধা।

রাধার দিকে চেয়ে বললাম, তুমি তো এখান থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছ।

রাধা বাইরের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। আমার কথা শুনে বিস্মিতভাবে বললে, কেন এখানে তো বেশ আছি!

সে আবার কি কথা! যেতে তো কোথাও হবেই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টুলুর দিকে চাইতে টুলু বললে, থাক না এখন ক'দিন।

বেশ!

রাধা গম্ভীরভাবে বললে, আমি টুলু-দিদিমণিকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।

আমি আর কিছুই বললাম না। থাকে থাক্। বরং ও থাকলে টুলুও একজন সঙ্গী পাবে। টুলুর পক্ষে সে বড় কম নয়।

৪

আমার বাড়ীটা বড় নয়। তবে এদের অসুবিধা হওয়ার মতো ছোটও না। তেতলার ঘর দু'খানি দিয়েছি টুলু আর রাধাকে ছেড়ে। দোতলার দু'খানি এতদিন প'ড়েই ছিল। আমি ব্যবহার করছি সেই দু'খানি ঘর। নীচের তলায় আমার বসবার ঘর।

মৃত্যুশোক সামলাতে মানুষের বেশী দেরী লাগে না। শোক যেখানে শুধু বিচ্ছেদের দুঃখ, সেখানে তুষের আগুনের মতো ধিকি-ধিকি জ্বলে। যেখানে শুধু তা নয়, যেখানে দুঃখের সঙ্গে আসে বিপদ, সেখানে মানুষকে দুঃখ ভুলে বুক বাঁধতে হয়। টুলুর হ'ল তাই। দু'দিনের মধ্যে তাকে সামলে নিতে হল। শোক করার অবসরকে সে কমিয়ে আনলে। তার জন্যে আমার ঠাকুরটির গেল চাকরী।

টুলু দু'বেলা রাঁধে। আমার জামা-কাপড় ধোপাবাড়ী দেয়, কোথাও ছিঁড়ে গেলে রিপু করে! মুদী-গয়লা-বাজারখরচের হিসাব রাখে। আরও নানা কাজ করে। রাধা আমার ঘর দোর পরিষ্কার রাখে। ছাদের আলশের টবে নানা ফুলের গাছ লাগিয়েছে, দু'জনে মিলে বিকেল বেলায় তাতে জল দেয়। ছাদের চিলেকোঠার ঘরে রাধা এক ব্রজকিশোর প্রতিষ্ঠা করেছে। রোজ সকালে ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুরের গলায় দেয়, আর আপনি পরে। কিছু ফুল আমিও পাই। রোজ সকালে একটি ছোট রেকাবীতে ক'রে আমার টেবিলে সাজিয়ে রেখে যায়। এর উপর টুলুর দর্জ্জির কাজ তো আছেই। আজকে টেবিলের ঢাকা তৈরী করছে, কাল আবার আমার একটা পাঞ্জাবী তৈরীতে হাত দিলে। শীত আসতে দেরী আছে, কিন্তু এরই মধ্যে ওর আয়োজন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এক জোড়া মোজা তৈরী আরম্ভ হয়েছে। তারপরে একটা গলাবন্ধ তৈরী হবে তাও জানিয়েছে।

মোটের উপর ওদের দু'জনের হাতে প'ড়ে এই ক'মাসেই বাড়ীর শ্রী গেছে ফিরে। মেঝে থেকে সীলিং পর্য্যন্ত সমস্ত ঝক্ঝক্ তক্তক্ করছে। এখন আর আমাকে কাছারী থেকে ফিরে এসে বাজারের খাবার খেতে হয় না। বন্ধু-বান্ধব এলে এক পেয়ালা চায়ের জন্যও অনাবশ্যক কাল অপেক্ষা করতে হয় না। অবাক হ'য়ে ভাবি, ঠিক কোন সময়ে কোন জিনিসটা আমার দরকার টুলু জানতে পারে কি ক'রে?

টুলুর মাকে পর পর দু'খানা চিঠি দিয়েছি। অবশ্য ওকে না জানিয়েই। একখানারও উত্তর এল না। বোধ করি কলঙ্কিনী মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখতে চান না তিনি। বৌদির কাছেও চিঠি লিখেছি। অনেকদিন পরে সম্প্রতি তিনি জবাব দিয়েছেন, এলাহাবাদ থেকে। ঘর-গৃহস্থালীর অনেক খুঁটিনাটি সংবাদ দিয়ে শেষের দিকে টুলুর সম্বন্ধেও দু'একটা কথা লিখেছেন। তারও সুর যেন বাঁকা-বাঁকা। বুঝলাম, ওদিকে বিশেষ ভরসা নেই। এখন একমাত্র আশা সুকোমলের। তার মন ফিরলেই একসঙ্গে সকল দিকের হাওয়া ফিরবে।

কিন্তু কি জানি কোথায় যে আমার মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা জমেছে, নিজে তার কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছি। এতদিন সুকোমলই হয়তো আমার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পেত। অন্ততঃ আমি মনে করতাম অপরাধ তারই। লজ্জাও তারই হওয়ার কথা। কিন্তু এখন যেন সব উল্‌টে গেছে। এখন প্রত্যহ যাই-যাই করেও তার কাছে যেতে পারছি না। কি কারণে বাধছে জানি না।

হয়তো সংস্কার। বহুকালের বহুপুরুষের পাপ-পূণ্য ভালোমন্দ বোধের বোঝা রয়েছে রক্তের মধ্যে। এড়িয়েও এড়ানো যায় না। জট ছেড়েও ছাড়ে না। মানুষের মন কোনকালেই যথেষ্ট সবল নয়। তার মনের শেষ দুর্ব্বলতার মধ্যে সংস্কার বাসা বাঁধে। এক পুরুষের সাধনায় এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। যুক্তি দিয়ে, তর্ক ক'রে

নিজেকে নিজে অনেক বোঝাই। সংস্কার যায় উড়ে। তবু কোথায় যেন একটুখানি কালো ছায়া ফেলে রেখে যায়। সে ছায়া পাপের। আশঙ্কা করছি, এই পাপ আমাকে স্পর্শ করেছে। সেই জন্যেই আমি সুকোমলের কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ করি।

দেখতে দেখতে মনে হ'ল টুলু যেন তার নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে ফিরে পেয়েছে। মনে হ'ল—মনে আর তার দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কিছু নেই। নিজেকে যেন সে নিশ্চিন্ত চিত্তে আমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। হাসিতে, গানে, গল্পে বর্ষার ভরা নদীর মতো আবার সে ফেঁপে উঠল। নীচে ব'সে তার কলহাস্য শুনতে পাই। অবসরক্ষণে ব'সে দু'দণ্ড হাসি-গল্প ক'রে আমিও যেন বেঁচে যাই। একটা রেডিও সেট তো আছেই, তার উপর নতুন একটা গ্রামোফোন এসেছে। ক'দিন থেকে বার বার তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে মাথা কুট্‌ছে, এ মাসে রোজগার যেন আমার বেশী হয়! একটা হার্মোনিয়ম না হ'লে তার আর চলছে না। শেখা গান ভুলে যেতে বসেছে। টিয়া পাখী আমার বাড়ীতে এসে গান ভুলে যাবে এ কলঙ্কও দুঃসহ। আসছে মাসের প্রথমে যা ক'রে হোক হার্মোনিয়াম একটা কিনে দিতেই হবে।

কিন্তু রাধাকে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে থাকে দিবারাত্রি টুলুর কাছে কাছে। দাসীর মতো তার সেবা করে। বড় বোনের মতো ক্ষুধা না থাকলেও জোর করে খাওয়ায়। সে হাসলে হাসে, মুখ ভার ক'রে থাকলে কি করবে ভেবে না পেয়ে অস্থির হ'য়ে ওঠে। কোথাও তার যেন সত্ত্বা নেই। রাধা টুলুর ছায়া, টুলুর প্রতিধ্বনি।

মাঝে মাঝে চাঁদিনী রাতে ছাদে আমাদের সাহিত্য-সভা বসে। রাধা মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা শোনে, হাসির কথায় আমরা হেসে উঠলে সেও হাসে। আর যদি কোনোদিন তর্ক তুমুল হ'য়ে ওঠে, সে শশব্যস্তে যাহোক একটা কিছু ব'লে আপোষ-

মীমাংসার চেষ্টা করে। তাতে আর কিছু হোক না হোক প্রচুর হাসির খোরাক মেলে। কিন্তু আমাদের পরিহাসে সে রাগ করে না। পরমানন্দে পরিপাক করে।

সেদিন গিয়েছিলাম সিনেমায়। মাঝে মাঝে যাই আজকাল। ছবিটি বড় ভালো লেগেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের একটি দ্বীপ। সমুদ্র গর্জ্জন করছে। তীরে নারিকেল বনশ্রেণী চোখে স্বপ্নের অঞ্জন লাগায়। সেইখানকার একটি প্রেমের ঘটনা নিয়ে বই। কাছের মানুষকে আরও কাছে পাওয়ার যে বাধা তাই ছবির বিষয় বস্তু। প্রচলিত সমাজবিধি, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উদ্দাম উদারতাকে খর্ব্ব করে আনার সনাতন প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে যে সমস্ত বাধা, বড় প্রেমের জন্যে মানুষকে যে সমস্ত বড় দুঃখ সইতে হয়, সইতে হয় যে মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা, স্তব্ধ হ'য়ে তাই চলেছিলাম দেখে। নিজেকে ছবির নায়কের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কখনও সমুদ্রে দিচ্ছিলাম ঝাঁপ, কখনও পাহাড়ে উঠে শিকারীর মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলাম কোথায় প্রিয়া। যখন ছবি শেষ হ'ল নিজের অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আলো জ্বলে উঠেছে। পাশে চেয়ে দেখি, টুলুর চোখে জল। তখনও স্তব্ধভাবে ঠায় ব'সে আছে।

বললাম, চল।

টুলু নিঃশব্দে আমার পিছনে বেরিয়ে এল।

বাড়ী ফিরে জিগ্যেস করলাম, বেশ ছবি! না?

তখনও টুলুর সম্পূর্ণ ঘোর কাটেনি। আধ মিনিট ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বেশ ছবি।

বললাম, বড় তপস্যা নইলে বড় বস্তু মেলে না। কি বল?

টুলু ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ!

হঠাৎ এক সময় জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, একটা কথা ভাবছি টুলু, অত দুরন্ত যে সাধনা, অত বড় ক্লেশ স্বীকার, কিন্তু তার বদলে কী ও পেলে? কী সে বস্তু?

টুলু বিস্মিতভাবে বললে, আবার কি পাবে? যাকে চেয়েছিল তাকেই তো পেলে?

আমি মুখ টিপে একটু হাসলাম। বললাম, মনে কর আরও দশ বছর যদি ওকে এমনি ক'রে ঘুরতে হ'ত, কিম্বা আরও বিশ বছর? কী পেত তাহ'লে? ওর নিজের বয়স তখন যদি হ'ত ষাট, আর মেয়েটির পঞ্চান্ন। মনে কর, একজনের তখন দাড়ি হয়েছে কাশ ফুলের মতো, আর একজনেরও চুলে ধ'রেছে পাক, চামড়া হ'য়েছে লোল, নলিননয়নের কটাক্ষ গেছে হারিয়ে। তাহ'লে?

টুলু অকস্মাৎ শিউরে উঠল। এক মিনিট কি যেন ভাববার চেষ্টা করলে। বললে, কি জানি?

—আমি জানি। দু'জনেই হতাশভাবে সেদিন ভাবত কি মিথ্যে পণ্ডশ্রমই করা গেল!

টুলু নিঃশব্দে নতনেত্রে তার হাঁটুর কাছের শাড়ীর পাড়টা সমান করতে লাগল।

বললাম, ক'টা বছর আগে পেয়েছে ব'লেই এমন সার্থক হ'ল। নইলে সবই মিথ্যে হয়ে যেত টুলু, সমস্ত ক্লেশ স্বীকারই মিথ্যে হয়ে যেত।

টুলু বললে, কেন বুড়ো-বুড়ী কি ভালোবাসে না?

হেসে বললাম, বাসে। কিন্তু এই মাদকতা তারা কোথায় পাবে? কোথায় পাবে হাঙরের দাঁতের পাশ দিয়ে তীরের মতো জল কেটে যাওয়ার সাহস? কোথায় বা পাবে গিরি-দরী-বন পার হওয়ার উত্তেজনা? স্থাণু মন কি এত বড় ক্লেশ স্বীকার করতে পারে?

টুলু কিছুই বললে না। বোধ হয় কথাটা মনে-মনে ভাবতে লাগল।

ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পট্ ক'রে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা তুমি যদি নায়িকা হ'তে কি করতে?

টুলু বিহ্বল চোখ তুলে বিব্রতভাবে বললে, আমি তো সাঁতার জানি না মৃণালবাবু।

এর চেয়ে ভালো উত্তর আর হ'তে পারে না। যে সাঁতার জানে ওই অবস্থায় পড়লে সে সাঁতার কেটেই যায়। যে জানে না সে করবে কি? জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে? তীরে আছড়ে প'ড়ে অসহায়ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করবে? বুক চাপড়ে নদীর ধারে ধারে ছুটে বেড়াবে? সে কান্নায় আকাশ হয়তো ব্যথিত হবে, নারিকেল বনশ্রেণী করুণভাবে মাথা নাড়বে, বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে নামবে বিষন্ন ছায়া। যা যা আবশ্যকীয় সবই হবে, কেবল গল্প জমবে না। টুলু অজ্ঞাতসারেও বুঝতে পেরেছে সমস্ত গল্পটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই হাঙরের দাঁতের পাশ দিয়ে জল কেটে যাওয়ায় আর অসীমসাহসিকতায় গিরি-দরী-বন পার হওয়ায়।

ইতিমধ্যে রাধা এক থালা গরম লুচি নিয়ে উপস্থিত হ'ল। এরই মধ্যে কখন সে শুদ্ধ কাপড় পরেছে এবং লুচিও ভেজেছে। সেইজন্যে রাধাকে আমার এত ভাল লাগে। সে যা জানে না তার জন্যে সময়ক্ষেপও করে না। তাই আমরা দু'জনে যখন ছবি নিয়ে গবেষণা করেছি সে তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে লুচি ভেজেছে। ভালোই করেছে। তর্কের কল্যাণে আমি বেশ ক্ষুধার্ত্ত হয়ে উঠেছিলাম।

ঘরের হাওয়া বদলাবার জন্যে আমি হেসে টুলুকে বললাম, জানো না সাঁতার? তাহ'লে চট্‌পট্ শিখে নাও।

টুলুও হেসে ফেললে।

রাধাকে জিগ্যেস করলাম, ছবি কেমন লাগল রাধা?

রাধা ঠোঁট উল্‌টে বললে, ছাই। কী যে সাহেব-মেমের নৃত্য আপনাদের ভালো লাগে আমি তো বুঝি না।

—তোমার ভালো লাগে না?

নাক সিঁটকে রাধা বললে, ওর আমি এক বর্ণও বুঝি না। তার চেয়ে সেদিন যে প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখলাম···

আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম।

রাধা রাগ ক'রে বললে, তা হাস্থনই আর যাই করুন, আমার কাছে লুকোছাপি নেই। স্পষ্ট কথা ব'লে দিলাম।

আমি হাসি থামিয়ে বললাম, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমারও ভাল লাগে না রাধা। শুধু টুলুর খাতিরে যাই।

রাধা গম্ভীরভাবে বললে, ওর যত অদ্ভুত বাই।

সকাল বেলায় টুলু এসে বললে, দেখি, চরণ দু'খানি বের করুন তো।

বিস্মিতভাবে বললাম, সকাল বেলায় হঠাৎ চরণ দু'খানির প্রয়োজন হ'ল? কি ব্যাপার?

কাপড়ের ভেতর থেকে এক জোড়া মোজা বের ক'রে হাসতে হাসতে বললে, দেখি ঠিক হ'ল কি না।

হাত বাড়িয়ে বললাম, আমাকে দাও দেখছি।

টুলু এক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, সে হবে না। আমি নিজে পরিয়ে দোব।

টুলু ঘাড় নেড়ে হাত নেড়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। শেষে বাধ্য হ'য়ে বের করতে হ'ল চরণ দু'খানি। ও যখন জেদ করে তখন নোয়ানো অসম্ভব।

টুলু আমার সম্মুখে হাঁটু গেড়ে ব'সে একটি একটি ক'রে মোজা পরিয়ে দিতে লাগল। বললে, আমি পা ছুঁলে দোষ হবে না কি?

বললাম, না দোষ নয়। তবে পা আমি কাউকে ছুঁতে দিই না।

টুলু মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, আমাকে দিতে হবে।

আবার বললে, আর কেউ পা ছুঁতে এসেছিল নাকি?

বললাম, আমার পা ছুঁতে কে আর আসবে?

—তবে যে বললেন পা ছুঁতে দেন না? আপনার পা ছুঁচ্ছে কে? কার এত গরজ পড়েছে?

হেসে বললাম, তা ঠিক।

পায়ের সঙ্গে মোজা বেশ টান ক'রে পরিয়ে দিয়ে টুলু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখুন তো কি চমৎকার ফিট্ ক'রেছে! এমন মোজা প'রেছেন কোনোদিন?

—পরিনি। মোজা অনেক পরেছি টুলু, কিন্তু তার কোনোটাই বিশেষ ক'রে আমার জন্যে তৈরী হয়নি।

তারপরে একটু বিশেষভাবে হেসে বললাম, এমন যত্ন ক'রে কেউ পরিয়েও দেয়নি।

টুলু মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, যান।

ব'লেই ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি একটু হেসে আরাম কেদারায় আবার ভালো ক'রে শুলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার টুলু ফিরে এল। দোর গোড়া থেকে বললে, বাঃ! দিব্যি শুয়ে আছেন যে! আজ কাছারী নেই বুঝি? না?

ওঠবার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে বললাম, আছে বই কি। আর কিছু না থাক ওইটে আছে।

কোপ কটাক্ষ হেনে টুলু বললে, থাকবে না কেন? রাগটুকু তো ষোল আনার ওপর আঠারো আনা আছে।

—রাগের কথাটা কি হ'ল?

টুলু ঘাড় নেড়ে বললে, হ'ল না হ'ল আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারব না। কাছারী যদি যেতে হয় উঠতে হ'য়েছে। দশটা বেজে গেছে।

চমকে উঠলাম। আজ আমার একটা জরুরী মামলা আছে। সবিস্ময়ে বললাম, দশটা বেজে গেছে?

—বাজবে না? ঘড়িটা তো আর রাগ করেনি?

জামা খুলতে খুলতে বললাম, আমিও রাগ করিনি।

—না, করেন নি! থাকা না থাকার কথাটা তবে তুললেন

কেন ? আপনার যা আছে তাই বা ক'জনের আছে ? সকলের কি সব থাকে ? আমার যে কিছুই নেই !

এবারে টুলুর দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম, কিছুই নেই কি ক'রে জানলে ?

ঘাড় নীচু ক'রে টুলু বললে, সে আমি জানি।

—তুমি কিছুই জান না।

টুলু হেসে ফেললে। বললে, বেশ, জানি না তো জানি না। আপনি উঠুন দেখি।

টুলু চলে গেল।

কিছুই নেই একথা বলা ঠিক হয়নি। ওর দুঃখ দূর করার জন্যে আমি যে কি করি সে কি তা জানে না ? ওর জীবনযাত্রায় আমার কি কোনো স্থান নেই ?

কিন্তু তখনই ও ফিরে এল। বললে, যাক্‌গে। কখন ফিরছেন বলুন তো ?

—যেমন ফিরি।

—মানে পাঁচটা, ছ'টা ?

—মানে সাতটা, আটটা।

টুলু ঘাড় নেড়ে বললে, সে হবে না। আজকে ছ'টার মধ্যে ফিরতেই হবে।

—ফিরতেই হবে ? ব্যাপারটা কি ?

ও মুখ নীচু ক'রে হাসতে হাসতে বললে, ব্যাপারটা থিয়েটার। টিকিট কেনা হ'য়ে গেছে। রাধার জন্যেই কেনা। বেচারী সিনেমা দেখে দেখে হয়রান হ'য়ে গেছে। আসছেন তো ঠিক ?

বললাম, আসব।

বললে, ঠিক? নইলে কিন্তু রাধা ভীষণ চট্‌বে।

মনে হ'ল দরজার আড়াল থেকে কে যেন দ্রুতপদে পালিয়ে গেল। টুলু বললে, ওর জন্যে এত খরচ ক'রে টিকিট কেনা হ'য়েছে শুনে পর্য্যন্ত ও আর এ দিক মাড়াচ্ছে না।

হাসতে হাসতে বললাম, তার আর লজ্জা কি? ইচ্ছে হ'য়েছে দেখবে না?

৫

বাইরের পরিধি ক্রমেই আমার ছোট হ'য়ে আসছে। মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাওয়ার যে অভ্যাস ছিল সে তো ছেড়েই দিয়েছি, ক্লাবে যাওয়াও আজকাল বড় একটা ঘটে ওঠে না। কাছারী থেকে সোজা বাড়ী ফিরি। সন্ধ্যাবেলায় একটু রেডিও, একটু গ্রামোফোন, মাঝে মাঝে টুলু গান গেয়ে শোনায়, তারপরে লুডো খেলা। রাত্রি বারোটা একটা পর্য্যন্ত এই চলে। এ ছাড়া থিয়েটার আছে, বায়োস্কোপ আছে, তারপর শীতের রাত্রে সার্কাস আছে, কার্নিভ্যাল আছে। সময় কাটাবার জিনিষের অভাব নেই। কেবল সাহিত্য চর্চ্চাটা ক'মে গেছে। সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই টুলু হাই তোলে।

জিগ্যেস করলাম, তুমি কি সাহিত্য ছেড়ে দিলে না কি?

টুলু হেসে বললে, হ্যাঁ।

—এ বিরাগের কারণ?

আলস্য ভেঙে টুলু বললে, কি হবে কতকগুলো মিথ্যে কথা প'ড়ে আর মিথ্যে কথা লিখে?

বললাম, মিথ্যে কি রকম?

বললে, মিথ্যে না তো কি? তাহ'লে শুনুন আমি একবার একটা গল্প লিখেছিলাম। একটি মেয়ের দুঃখের কথা।

ম্লান হেসে বললে, সেই গল্পই হ'ল কাল। যাকগে। লিখলাম একটি মেয়ের গল্প। গল্প প'ড়ে লোকে কেঁদে আর বাঁচে না। আমারও ধারণা হ'য়েছিল গল্পটি সত্যি হ'য়েছে। তখন তো জানতাম না সত্যিকার দুঃখের রূপ কি! এখন বুঝছি ওর চেয়ে মিথ্যে গল্প আর হ'তে পারে না।

বললাম, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তাইতো একমাত্র সত্যি নয়। গল্পের সত্যের রূপ আলাদা।

বললে, সে আমি জানি। কিন্তু দুঃখের নাম ক'রে দুঃখের বিলাস, ও নিয়ে গল্প আর লিখব না। দুঃখের সত্যিকার রুক্ষ কর্কশ রূপের সঙ্গে আজ পরিচয় ঘটেছে। আজ বুঝেছি দুঃখ কি ভয়ঙ্কর! তাই মিথ্যে লিখতেও মন সরে না, পড়তেও মন সরে না। মৃণালবাবু, মানুষের দুঃখ নিয়ে পরিহাস করা পাপ।

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম, তোমাকে একটা কথা আমি বলিনি টুলু। সুকোমলকে আমি একখানা চিঠি লিখেছিলাম।

উৎসুক দৃষ্টিতে টুলু আমার দিকে চাইল।

বললাম, সে চিঠির কোনো জবাব পাইনি এতদিন। কাল এসেছে। টুলু নিরুত্তর রইল।

আমি বলতে লাগলাম, এতদিন ছিল না এখানে। বাইরে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, সম্প্রতি ফিরেছে! লিখেছে তার শরীর সুস্থ নেই। কি না কি কঠিন অসুখ হয়েছিল।

ওর মুখ ক্রমেই কঠিন হ'য়ে উঠছিল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

—লিখেছে, শরীর সুস্থ হ'লে একদিন আসবে। ইতিমধ্যে আমি যেন একবার যাই। অনেক কথা লিখেছে। আনব চিঠিখানা?

টুলু ঘাড় নেড়ে জানালে, দরকার নেই।

বললাম, তোমার কথাও লিখেছে। মনে হ'ল সুরটা ভালোই।

টুলু কঠিন কণ্ঠে বললে, বাধিত হ'লাম।

ওর মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। ভেবেছিলাম, মুখে কিছু না বললেও এই একটি সংবাদের জন্যে সে মনে মনে ম'রে যাচ্ছে। ওর নিস্পৃহ ভাবে এবং কঠিন কথা শুনে মনে হ'ল ব্যাপারটা অত সহজ হয়তো হবে না। আশঙ্কা হ'ল ভেতরে টুলু যথেষ্ট উত্তপ্ত হ'য়ে আছে। নোয়াতে দেরী হবে। তবু এছাড়া আমার উপায় নেই।

ধীরে ধীরে আমার মনে পাপ উঠছে জমে। টুলু কথা বলে বেশী, হাসে বেশী, আমার কাছে কাছে ঘোরে বেশী। ওর তরঙ্গিত হাসি, চটুল কথা, সুমধুর কলহ ক্রমেই যেন আমাকে পাকে পাকে বাঁধছে। নিজেকে বারে বারে সতর্ক করি। কিন্তু সতর্কতা মিথ্যা। একই বাড়ীতে থেকে টুলুকে এড়িয়ে চলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। আমার পথে ও এসে পড়বেই। বয়স ওর হ'য়েছে, ছোট তো আর নয়! ও কি জানে না, পুরুষের মধ্যে আগুন জ্বালাতে এক মিনিটের বেশী লাগে না? জানে। তবু ও আসবেই। নানা ছলে, নানা ছুতোয় আসবে। আমাকে একটি মুহূর্ত্ত নিস্কৃতি দেবে না। আমাকে নইলে একটি মুহূর্ত্ত ওর চলবে না।

সেই তো বিপদ। সেই ভয়ে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে সুকোমলকে লিখি চিঠি। ভেবেছিলাম, সুকোমলকে যদি কিছু নরম করতে পারি,—সেও তো স্বামী, ভালোবেসেছিল,—যদি কোনোদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে টুলুকে গ্রহণ করে, আমি যাব বেঁচে। দুঃখ আমার যত বড়ই হোক, তবু যাব বেঁচে। আপনাকে দিন রাত্রি চোখে চোখে রাখার হাত থেকে পাব রেহাই। কিন্তু এখন দেখছি সমস্যা শুধু সুকোমলকে নিয়েই নয়। টুলু তো আর রাধার মতো মাটির ঢেলা নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, অহঙ্কার আছে। আপন আত্মাকে সে সম্মান করে। সে সম্মান সহজে ঘুচবে এমন তো মনে হয় না। তাকে আমি চিনেছি।

আমি আবদারের সুরে বললাম, একটা অনুরোধ করব টুলু?

টুলু হেসে বললে, নিশ্চয়।

—আজকে সন্ধ্যায় চল না দু'জনে যাই। লিখেছে অসুখ··· যাবে?

টুলুর মুখ দেখতে দেখতে কঠিন হ'য়ে উঠল। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না।

বললাম, কী ক্ষতি!

টুলু অকস্মাৎ বারুদের মতো জ্বলে উঠল। বললে, অনেক ক্ষতি। আপনারা বুঝবেন না। সে চোখ আপনাদের নেই। মৃণালবাবু, আপনারা আমাদের কী ভাবেন?—আমরা কি কুকুর?—তাড়িয়ে দিলেই ছুটে পালাব, আর আঙ্গুল নেড়ে ডাকলেই ছুটে এসে পায়ের কাছে ল্যাজ নাড়ব? আমাদের কি আত্মা নেই? মন নেই? প্রাণ নেই? মর্য্যাদা ব'লে কিছুই নেই? কী আপনাদের ধারণা?

বললাম, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া কি হয় না টুলু? সকালে হয়, সন্ধ্যা বেলায় মিটে যায়।

বললে, সে আমি জানি। কিন্তু এ তা নয়। এ আমার সমস্ত সত্তাকে নিয়ে কথা। যিনি আমাকে অকারণে সন্দেহ ক'রেছেন, আমার মর্য্যাদার কথা একবারও ভাবেন নি, তাঁকে কেনোদিন ক্ষমা করতে পারব না। কোনদিন না। আপনি বললেও না।

টুলু গট্ গট্ ক'রে উঠে চলে গেল।

তখনি আবার ফিরে এসে বললে, আপনি সেখানে যান না যান আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু একটা কথা। সেখানে দয়া ক'রে আমার প্রসঙ্গ তুলবেন না। আমার কাছেও তাঁর প্রসঙ্গ না তুললে সুখী হব।

টুলু আর দাঁড়াল না। ওর এমন ক্রোধ আমি কখনও দেখিনি। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম। মনে হ'ল কথাটা ঠিক বলা হয়নি। কোথায় কি যেন ভুল ক'রেছি। বোধ হয় আমার আরও অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু মনের অবস্থা আরও সহজ হ'লেই কি ও বুঝবে? তেমন মেয়েই নয়। কে জানে হয়তো—বাইরে যাই দেখাক—আমার এখানে কিছুতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। ভিতরে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলেছে! স্বামীর লাঞ্ছনা প্রতিমুহূর্ত্তে ওকে বিঁধছে! ভুলতে পারছে না।

স্থির ক'রেছিলাম সন্ধ্যার সময় স্থকোমলের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তার চিঠি পাওয়ার পরে সঙ্কোচ আমার কেটে গিয়েছে। বুঝেছি আমার প্রতি সে বিরূপ হয়নি। বিশ্বাসও হারায়নি। তার কাছে আমার লজ্জা করার কোনো কারণ নেই।

স্থকোমল অস্থস্থ। তার অস্থখ কোথায় বুঝি। কেন যে সে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায় তারও কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। সন্দেহের জ্বালা তাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও স্থির হ'য়ে বসতে দিচ্ছে না। মন তার জর্জ্জরিত। এতদিনে বোধ করি অবসাদ এসেছে। আর সে পারছে না। যে-টুলুকে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে পারত না, তাকে ছেড়ে বাঁচা তার পক্ষে অসম্ভব। সে আর পারছে না। আমাকে সে চায়। হয়তো আমার মুখ থেকে একবার শুনতে চায়, টুলু অবিশ্বাসিনী নয়। শুধু মুখের কথা। তারপর, মনের সন্দেহ মন থেকে মুছে যাক আর না যাক, যা হবার হোক, টুলুকে সে গ্রহণ করবে। এমন ক'রে বেঁচে থাকতে আর সে পারছে না।

এ আমার অনুমান। কিন্তু স্থকোমলকে যে জানে, যে জানে টুলুকে সে কত ভালোবাসে, সে এ ছাড়া আর কিছু অনুমান করবে না। করতে পারে না। মনে হয়, এখন একবার তার কাছে যাওয়ার অপেক্ষা। বাকী আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু টুলুর কথা শুনে সে ইচ্ছা আর রইল না। বুঝলাম, মানুষ ইচ্ছা ক'রে তার চলার স্থগম পথ কণ্টকিত করবেই।

কাছারী থেকে ফিরে চুপি চুপি নীচের ঘরেই ব'সে রইলাম, অন্ধকারে। আলোটা জ্বালাতে ইচ্ছা হ'ল না। আমি যে কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। নানা ভাবের সমাবেশে মনে কি রকম অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। অন্ধকারেই ব'সে রইলাম।

কতক্ষণ এমন ভাবে ব'সে ছিলাম জানি না। বোধ হয় অনেকক্ষণ হবে। হঠাৎ এক সময় আলো জ্বলে উঠল।

টুলু।

বললে, অন্ধকারে ব'সে যে!

বললাম, তাই তো দেখছি!

টুলু হেসে উঠল, তাই তো দেখছেন? আরেকটু আগে দেখলে হ'ত! কতক্ষণ এসেছেন?

—কি জানি!

টুলু আবার হেসে উঠল। বললে, তাও জানেন না? হাতে ঘড়িটা আছে তো? না তাও নেই?

আমি জবাব দিলাম না। টুলু আমার টেবিলটা গোছাতে লাগল। হঠাৎ শুষ্কমুখে জিগ্যেস করলে, আপনার অসুখ করেনি তো? অমন চুপ ক'রে আছেন কেন?

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই সে তার ফুলের মতো নরম হাত দিয়ে আমার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রলে।

আশ্বস্ত ভাবে বললে, না, জ্বর হয়নি। তবে অমন ক'রে আছেন কেন? আমার সঙ্গে কথা কইবেন না? রাগ করেছেন?

আমি একটু ফাঁকা হাসি হাসলাম।

টুলু বললে, রাগলেন তো ব'য়ে গেল। জল খাবার খাবেন তো? না, তাও জানেন না?

টুলু আমাকে নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে ব'সে একটু ভাবতেও দেবে না। উঠতেই হ'ল। বললাম, শুধু এক বাটি চা দাও।

—শুধু চা? কেন, জল খাবার কি দোষ করলে?

বললাম, ক্ষিধে নেই।

—ক্ষিধে নেই? খেয়ে এসেছেন? খেলেন কেন? আপনার জন্যে খাবার তৈরী হয় জানেন না? এ খাবার খাবে কে? আমাদের পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছে? সে হবে না। রাধা!

রাধা এল।

টুলু বললে, মৃণালবাবু এসেছেন এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, কি কত ঘণ্টা

হ'ল তাও জানেন না। অন্ধকারে ব'সে ছিলেন। বলছেন ক্ষিধে নেই। শুধু এক বাটি চা খাবেন।

রাধা বললে, শুধু চা মানুষে আবার খায় না কি?

রাধা বেরিয়ে গেল। এবং আমি হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক ছেড়ে আসতে না আসতে রাধা এক থালা খাবার এনে হাজির করলে।

টুলু হেসে বললে, এবার তো আর না বলবার উপায় রইল না? খাবার আমার তৈরী নয়, রাধার তৈরী। এনেছেও সে নিজে। আমি ছুঁই নি পর্য্যন্ত। দেখুন না টেবিল থেকে স'রে দাঁড়িয়ে আছি!

রাধা আর দাঁড়াল না। ওর নিজের প্রসঙ্গ উঠলেই ও ভয়ানক লজ্জা পায়। লজ্জা পেলে আর দাঁড়াবে না। জুৎসই কথা ও বলতে পারে না।

টুলু অনেকক্ষণ পরে বললে, আমি যে দু'বেলা খাচ্ছি তাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে?

অবাক হ'য়ে বললাম, তার মনে?

বললে, তার মানে তো সোজা। জানতে চাচ্ছি আমাকে তাড়াবার জন্যে অত ব্যস্ত হ'য়েছেন কেন?

—ব্যস্ত হ'য়েছি কে বললে?

—আমিই বলছি। বলুন না, কথাটা সত্যি কি মিথ্যে?

তখনই তখনই উত্তর দিতে পারলাম না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে চা খেতে লাগলাম। তারপরে বললাম, কথাটা সত্যি। ক্ষুণ্ণভাবে টুলু বললে, আমি বড্ড বেশী ভার হয়েছি?

—ভারের জন্যে নয়।

—তবে?

নিঃশেষিত পেয়ালা সরিয়ে রেখে বললাম, সত্যি কথা শুনতে চাও?

টুলু ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই চায়।

বললাম, তাহ'লে শোন, ভারের জন্যে নয়, ভয়ের জন্যে। আমার মনে ভয় ঢুকেছে।

আমার স্থিরদৃষ্টির সামনে টুলু চোখ নামালে। অস্ফুটস্বরে বললে ভয় আবার কিসের ?

—কিসের ভয় ? তোমার ভয়। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে দুর্ব্বলতা এসেছে। নিজেকে আর বিশ্বাস নেই।

নিম্নকণ্ঠে টুলু বললে, বিশ্বাস না থাকে ভয়ে ভয়েই থাকবেন। আমাকে তাড়াবেন কেন ?

বললাম, তাড়াব না! শুধু আমার পথ থেকে তোমায় সরাতে চাই।

—দাঁড়ান!

ব'লে টুলু বাইরে উঁকি দিয়ে কি দেখে এল। ফিরে এসে একেবারে আমার সোফার পাশে এসে দাঁড়াল। উত্তেজিত নিম্ন কণ্ঠে বললে, পুরুষ মানুষের এত ভয়ই বা কিসের ? বলুন না কি চান ?

ওর চোখ জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছিল। গলার স্বর কাঁপছিল।

বললে, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন! সবাই অনায়াসে যখন আমায় অসম্মানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তখন আপনি আমাকে সম্মানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ক'রেছেন। আপনি কি কারও চেয়ে পর ?

ওর হ'ল কি মনের জ্বালায় ও কি পাগল হ'য়ে গেল নাকি ? অকস্মাৎ ওর শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। ধপ্ ক'রে আমার শোফায় ব'সে পড়ে চীৎকার করে উঠল, আমার শরীর এমন করছে কেন ? আমাকে ধর না।

সঙ্গে সঙ্গে ওর অচৈতন্য দেহ আমার কোলের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল।

চীৎকার শুনে রাধা এল ছুটে। বললে কি হ'য়েছে? ভয়ে রাধার মুখ সুকিয়ে গেছে।

বললাম, বোধ হয় ফিট্ হয়েছে। শীগগির এক গ্লাস জল আন তো!

রাধা জল আনতে ছুটল। আমার কোলের মধ্যে ওর তখন খিঁচুনি আরম্ভ হ'য়েছে। কোথা থেকে ওর দেহে এত শক্তি এসেছে যে, একা আমার পক্ষে সামলান দায়। আমাকে উল্‌টে উল্‌টে ফেলে দেয়। আধ ঘণ্টার উপর এমনি ধস্তাধস্তির পর যেন একটু স্থির হ'ল। কিন্তু তখনও জ্ঞান ফিরে আসে নি। এমন সময় বাইরে যেন পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনলাম।

সাড়া দিলাম, কে?

—আমি সুকোমল।

সুকোমল নিজেই এসে পড়েছে। বললাম, এস।

রাধা স'রে গেল। সুকোমল আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকেই আমার কোলে টুলুকে তদবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল! বললে, কি ব্যাপার?

ধস্তাধস্তিতে টুলুর গায়ের কাপড় অসংবৃত। মাথার চুল এলিয়ে লুটিয়ে পড়েছে আমার পায়ের তলায়, ওর গায়ের কাপড় ঠিক ক'রে দিয়ে বললাম, ফিট হ'য়েছে।

সুকোমল একদৃষ্টে ওর বিবর্ণ ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাইতে চাইতে অন্যমনস্কভাবে বললে, আগে তো ছিল না!

বললাম, আগে ছিল না। আমিও আর দেখি নি। বোধ হয় এই প্রথম।

সুকোমল কি যেন ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে শুধু বললে, হুঁ।

খানিক পরে আবার বললে, এই প্রথম? তুমি বলছ এই—এই প্রথম? না?

—বোধ হয়।

সুকোমলের মুখ দিয়ে আবার বের হ'ল, হুঁ।

আরও অনেকক্ষণ কাটল। মিনিট পনেরো। টুলুর হাতের মুঠো ধীরে ধীরে খুলে গেল।

সুকোমল ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে এবার।

ডাকলাম, টুলু!

টুলু কথা বললে না, শুধু মাথা নেড়ে সাড়া দিলে! ধীরে ধীরে চোখ মেললে। তারপর সর্ব্বাঙ্গ ভালো ক'রে ঢেকে বসল। তখনও ওর অবসাদ কাটেনি

আমি উঠে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসলাম। বললাম, এখনও উঠো না টুলু। শুয়ে থাক আর একটু।

টুলু হাতের ইঙ্গিতে জানালে, বেশ আছি।

এতক্ষণে ওর দৃষ্টি পড়ল সুকোমলের ওপর। বোধ হয় তখনও ঘোর কাটে নি। বোধ হয় চিনতে দেরী হচ্ছিল। এই দু'তিন বছরের মধ্যেই তার মাথায় টাক প'ড়েছে। স্বল্পাবশিষ্ট চুলগুলি রুখু! অনেকদিন তেল পড়েনি হয়তো। গাল ভেঙে যাওয়ায় মুখখানি লম্বা দেখাচ্ছে। চিনতে দেরী হচ্ছিল। ঘোরও বোধ হয় কাটেনি। যেই চিনল, অমনি গম্ভীরভাবে উঠে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমিও দেখলাম। সুকোমলও দেখলে। কিন্তু কেউ একটা কথাও বলতে পারলাম না। সুকোমলের দিকে চেয়ে দেখি, সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মেঝের দিকে চেয়ে আছে। আর থেকে থেকে আপন মনেই মাথা নাড়ছে।

সুকোমলকে জিজ্ঞাসা করলাম কতদূর বেড়াতে গিয়েছিলে? অনেক দূর?

অন্যমনস্কভাবে সুকোমল উত্তর দিলে, অনেক দূর। কাশ্মীরটাশ্মীর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কাশ্মীর জায়গাটা ভালোই! কি বল? কথায় বলে, ভূ-স্বর্গ।

বললে, হুঁ

—ছুটি নিয়েছিলে বুঝি ?

—হুঁ।

—একাই গিয়েছিলে ?

—একাই।

—কিন্তু শরীর তো বিশেষ···

—না। শরীর কই আর সারল !

সাধারণ কুশল প্রশ্ন শেষ হ'ল। আর কি জিজ্ঞাসা করা যায় ? বললাম, কোনো একটা ভালো ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার কর।

সুকোমল উত্তর দিলে না, শুধু বাহিরের দিকে চেয়ে ম্লানভাবে একটু হাসলে।

গ্লানিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'জনে নিঃশব্দে ব'সে রইলাম। অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ন'টা বাজল। সে শব্দে সুকোমলের সংবিৎ ফিরে এল। একটু ইতস্তত ক'রে বললে, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মৃণাল।

আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল। ও কি টুলুকে নিয়ে যেতে এসেছে ? উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলাম।

অনেকক্ষণ ভেবে সুকোমল বললে, আমার বড় কষ্ট মৃণাল।

ওর চোখ ছলছল ক'বে উঠল। আমি নিঃশব্দে ব'সে রইলাম।

বললে আমার মনে শান্তি নেই।

মনে হ'ল, ঘরে আলো ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আসছে। হাওয়াও ভারী হ'য়ে উঠেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সুকোমল আর কিছু বললে না। চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগল।

তারপর বললে, আমার উপর তোমার ঘৃণার শেষ নাই। কিন্তু যদি জানতে কি আমার দুঃখ তাহ'লে করুণা করতে।

তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, ঘৃণার কথা নয় সুকোমল তুমি কিন্তু মস্ত বড় ভুল ক'রেছ।

—সে জানি। জানি ভুল ক'রেছি। মস্ত বড় ভুল। তুমি কি মনে কর, তোমরা টুলুকে চেন আর আমি চিনি না? চিনি। বুঝি ওর ভালোবাসায় কোথাও ফাঁকি নেই। তবু সন্দেহ করি। একবার আমার জন্যে ও জীবন দিতে বসেছিল। সেও চোখে দেখা। কিন্তু রোজ রোজ এত চিঠি ও কোথায় লেখে? একলা বেড়াতে যায় কেন? মেয়েমানুষের একলা বেড়াতে যাওয়া কি কথা?

ক্রোধে ও উত্তেজনায় সুকোমলের চোখ দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। ওর ক্রমাগত দম ফুরিয়ে আসছিল। দম নেবার জন্যে থামলে। ওর শীর্ণ বক্ষ হাপরের মতো ফুলে ফুলে উঠছিল।

বললাম, নিষেধ করনি কেন?

—করিনি! একশো বার ক'রেছিলাম। শোনে নি।

একটু থেমে বললে, স্পষ্ট ক'রে নিষেধ অবশ্য করি নি। কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে হাবে-ভাবে বলতে বাকী কিছুই রাখি নি। কিন্তু ও কিছুতে বুঝতে চাইলে না। অদৃষ্টে দুঃখ আছে কি না!

সুকোমল আবার চুপ করলে।

তারপর বলতে লাগল, এ দু'বছর কি ক'রেছি আর কি করি নি? বিকারের রোগীর মতো ছুটে ছুটে বেড়িয়েছি। ছোট বড় কোনো দেবতা বাকী রাখি নি। সবারই দোরে মাথা কুটেছি, আর বলেছি, শান্তি দাও, শান্তি দাও। দেবতা আমার, শান্তি দাও। তবু শান্তি পাই নি, জানো?

সুকোমল হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, পৃথিবীতে সব পাওয়া যায়, কেবল শান্তি পাওয়া যায় না।

ও আবার আপনমনে কি যেন ভাবতে বসল? হঠাৎ একসময় মাথা তুলে বললে, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? টুলু সত্যিই ভালো?

এতক্ষণ পরে এই কথা? সুকোমলের কি মাথার দোষ ঘটেছে?

বিরক্তভাবে বললাম, এর উত্তর আমার কাছ থেকে শুনে কি হবে বল ? আমার কথা তো বিশ্বাস করবে না !

সুকোমল সাগ্রহে বললে, করব বিশ্বাস। তুমি বল। আমার কি দরকার জানো ? সবাই মিলে এখন আমার কাছে কেবল বলুক, টুলু ভালো, টুলু ভালো, টুলু খুব ভালো। শুনতে শুনতে আমার হয় তো বিশ্বাস ফিরে আসবে।

সুকোমল আমাকে অবাক করেছে ! বাধ্য হ'য়ে মুখ ফুটে বলতে হ'ল, টুলু ভালো, টুলু সত্যিই খুব ভালো।

সুকোমল যেন আমার মুখের এই একটি কথার অপেক্ষায় ছিল। লাফিয়ে উঠে বললে, আমার নিজেরও তাই ধারণা। আমি টুলুর সঙ্গে একবার দেখা করব মৃণাল। তুমি খবর দাও।

আমি খবর দিতে উপরে গেলাম ! দেখি ঘরের বাইরে দরজার গোড়ায় টুলু সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে জড়সড় হ'য়ে বসে আছে।

বললাম, বাইরে ব'সে কেন টুলু ? ঠাণ্ডা কত ? ঘরে গিয়ে একটু শুলেই তো পারতে !

টুলুর সাড়া না পেয়ে ভয় হ'ল। জোর ক'রে ডাকলাম টুলু !

ও ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে চাইলে।

--বলছিলাম, ঘরে গিয়ে শুলে না কেন ? বাইরে বড় ঠাণ্ডা।

বললে, বেশ আছি।

ব'লে যেমন মুখ ঢেকে বসেছিল, আবার তেমনি বসল। আমিও ধীরে ধীরে ওর সুমুখে মেঝের ওপর বসলাম। কিন্তু সে বোধ হয় টুলু লক্ষ্যও ক'রল না।

স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলাম, টুলু।

ও মুখ না তুলেই বললে, বলুন।

—সুকোমল বলছিল···

—সে যায়নি এখনও ?—টুলু চীৎকার ক'রে উঠল।

শান্তভাবে বললাম, তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যায় কি ক'রে? তাকে কি আনব এখানে?

কিন্তু টুলু শান্ত হ'ল না। বললে, কখনো না। আমার সময় হবে না। তাকে ব'লে দিন আমি দেখা করব না।

ধীরে ধীরে বললাম, সে কি হয়?

টুলু অধীর কণ্ঠে বললে, আপনাকে যা বললাম তাই গিয়ে বলুন না। যান।

ওর ভাবগতিক দেখে আমি ভয় পেলাম। আর বাক্যব্যয় না ক'রে নীচে ফিরে এলাম। দেখি সুকোমল গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আমি কি ক'রব ভেবে না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে সুকোমল মুখ তুলে বললে, তুমি তাজমহল দেখেছ মৃণাল?

তাজমহল! সুকোমল টুলুর কথা ভুলেই গেছে বোধ হয়!—বললাম, না!

সুকোমল গম্ভীরভাবে বললে, দেখে এস। একটা দেখবার মতো জিনিস। আচ্ছা, উঠি আজকে।

বললাম, টুলু তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুকোমল নিস্পৃহভাবে বললে, থাক, থাক। তাকে আর এখন বিরক্ত করতে হবে না।

সুকোমলকে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

৬

সেদিন রাত্রে এবং পরদিন সকালে টুলু আর নীচে নামল না। আমিও আর উপরে যাইনি। কাছারী থেকে ফিরে আসতে টুলু ধীরে ধীরে নেমে এসে আমার টেবিলের ধার ঘেঁসে দাঁড়াল।

বললে, রাগ পড়েছে?

আমি হাসলাম।

ও হেসে বললে, কতখানি রাগ হ'য়েছিল?

একথারও উত্তরে আমি শুধু হাসলাম।

টুলু আবার বললে, আপনার কি মনে হয়, আমার ওঁর ওখানে যাওয়াই উচিত?

বললাম, সে তুমিই ভালো বোঝ।

বললে, আমি যা ভালো বুঝি সে তো ক'রেইছি। আপনার মত কি তাই বলুন।

বললাম, ক'রে যখন ফেলেছ তখন আর আমার মত জিগ্যেস করা অনাবশ্যক।

—অনাবশ্যক?—টুলু মাথাটা দুলিয়ে বললে, আচ্ছা আমি না হয় গেলাম, কিন্তু, সত্যি বলুন, আপনার তাতে কিছু কষ্ট হবে না? কিচ্ছু কষ্ট হবে না?

বললাম, এ প্রশ্নও অনাবশ্যক। তোমার যাওয়া যদি উচিত হয়, তাহ'লে আমার কষ্ট হ'লেও যাওয়া উচিত, না হ'লেও যাওয়া উচিত।

টুলু একখানা চেয়ারে আরাম ক'রে ব'সে বললে, আমি যাব না যান। কি করবেন করুন।

এমন সময় রাধা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সে বললে, কোথায় যাবে না—কোথায়?

টুলু চোখ টিপে বললে, সিনেমায়। মৃণালবাবুর রোজ রোজ সিনেমা যাওয়া! আমি তো যাব না বাপু। তুমি যাবে?

সিনেমা সম্বন্ধে রাধার কোনোদিনই আগ্রহ নেই। সে ঠোঁট উলটে এক প্রকার শব্দ করলে।

টুলু বললে, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। তোমার টিকিট কেনা হ'য়ে গেছে।

রাধা বুঝতেই পারলে না টুলু তাকে নিয়ে পরিহাস করছে। গম্ভীরভাবে বললে, হোকগে টিকিট কেনা। আমি এই শীতে আর বের হচ্ছি না।

বেশী গোলযোগের আশঙ্কায় রাধা কালবিলম্ব না ক'রে স'রে পড়ল। তখন সবে সন্ধ্যা হ'য়েছে। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, বললাম, যাবে সিনেমায়? এখনও সময় আছে!

টুলু হেসে বললে, না, না, আমি রাধাকে ঠাট্টা করছিলাম।

—সে আমিও জানি। কিন্তু চলই না সিনেমায়। চমৎকার একটা ছবি আছে।

টুলু বললে, আজ আর কি ক'রে হয়? দেখলেন তো রাধার ইচ্ছে নেই।

—ইচ্ছে নেই, ও যাবে না। চল তোমাতে আমাতে যাই।—ওর একখানা হাত আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, শুধু দু'জনে। কেমন?

টুলু ধীরে ধীরে হাতখানা সরিয়ে নিলে। নিম্নস্বরে নতমুখে বললে, আজ থাক!

আমিও আর অগ্রসর হ'তে সাহস করলাম না। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললাম, আচ্ছা আজ থাক। আমারও একটু কাজ আছে। কিন্তু কাল নিশ্চয় যেতে হবে। কেমন?

টুলু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে কি অসম্মতি জানালে ঠিক বোঝা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বললে কিছুদিন থেকে রাধা আর আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না। কিন্তু আজ মুস্কিলে পড়েছে।

আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘোঁট পাকাচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে জিগ্যেস করলাম, কেন ?

—আজ মাংস।

বললাম, ও।

টুলু হেসে বললে, বৃন্দাবনের মানুষ। নিরিমিষ চমৎকার রাঁধে। মাছটাও আমার পাল্লায় প'ড়ে রাঁধছে। কিন্তু মাংস ছোঁবে না পর্য্যন্ত।

বললাম, তাহ'লে মাংস আনাবার কি দরকার ছিল ?

টুলু হেসে বললে, বেশ ! ও ছোঁবে না ব'লে মাংস আসবে না ?

বললাম, সে জন্যে নয়। তোমার এই শরীরে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় না যাওয়াই উচিত।

টুলু হাসলে। বললে, কেন ? আমার শরীরে ত্রুটিটা কী ঘটেছে ?

বললাম, এই ফিট-টীটের অসুখে…

টুলু কথাটা উড়িয়ে দিয়ে জিভে একটা টোকা দিয়ে বললে, ওঃ !

তারপর বাইরে চলে গেল।

টুলু বহুরূপী। মিনিটে মিনিটে রং বদলায়।

ওর মনের আমি ঠিকানা পেলাম না। আকাশের শুকতারা আপন ইচ্ছায় আমার মনের মাটিতে নেমে এল। তবে না আমার মনে ভরসা এল, সাহস এল, এল সুদুর্জ্জয় আশা ! ও নিজে না সাহস দিলে আমার সাধ্য কি ওকে বাঞ্ছা করি ! কি সাধ্য আমার সঙ্কোচকুণ্ঠিত অন্তরের সুগোপন আশা আকারে, ইঙ্গিতে, ভাবে ওর সুমুখে প্রকাশ করি।

একথা সত্য, আমার লোভার্ত্ত মনে সাহস ও নিজেই জুগিয়েছে। কখনও মুখের কথায়, কখনও চোখের ভাষায় ওই তো জাগিয়েছে সুদুর্লভের কামনা। বলেছে, কেন আমি সঙ্কোচে পিছিয়ে থাকি, কেন করি ভয়? আমি কি কারও চেয়ে পর? বলেছে, এখান থেকে কিছুতে সে যাবে না। কিছুতে না। আমি ছাড়তে চাইলেও, না।

ওর প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গসুখ আমার মূক চিত্তকে নিয়ত মুখর করতে চেয়েছে। ভাবে—ভয়। ভাবে, সঙ্কোচে থাকি পিছিয়ে। কিন্তু এ যে ভয়ে নয়, সঙ্কোচে নয়, এ যে শুধু অপরিসীম শ্রদ্ধায়, সে কথা বোঝেনি। পুরুষের মনোভাব সম্বন্ধে মেয়েরা কদাচিৎ ভুল করে। কেবল শ্রদ্ধা বোঝে না। বিজয়িনী নারীর প্রতি পুরুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাকে কেবলই ভুল বোঝে। ভাবে—ভয়, নয় ভাবে—চাটুকারিতা।

টুলুও ভেবেছে ভয়। সেই ভয় ভাঙাবার জন্যে বহু আয়োজন করেছে। আর ভেবেছে, কিছুতে ভাঙে না, এ কেমন ভয়! স্পর্শব্যাকুল বাহু লোভার্ত্ত হ'য়েও হয় না, এ কেমন সঙ্কোচ! অবশেষে এল আপনার সমস্ত চিত্তকে আমার সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে ধরতে। আপনার দেহ, মন সমস্ত নিঃশেষে নিবেদন করতে। কিন্তু পার্‌ল না কেন? কেন ভেঙে পড়ল? এ সঙ্কল্প কিছু একটা আকস্মিক মহানুভবতায় তার মনে জাগেনি। এমন ক'রে আত্মপ্রকাশ করার পূর্ব্বে অনেকবার ভেবেছে নিশ্চয়। তবু পারল না কেন? কোথায় বাধা?

মাঝে মাঝে মনে হয়, কোথায় যেন এর মধ্যে মহানুভবতাও আছে। টুলু নিজেও ভুলতে পারে না, আমাকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্বার যখন বন্ধ হ'য়ে গেছে তখন আমার কাছে মিলেছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সমস্ত অসম্মানের বিরুদ্ধে আমি তাকে সম্মানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ও যা কিছু করে, যা কিছু বলে

তার মধ্যে যেন দেনা শোধ করার ব্যাকুলতার পরিচয় পাই। জানে, এতে আমি ক্ষুণ্ণ হই, ক্ষুব্ধ হই, তাই প্রাণপ্রণে সে চেষ্টা গোপন ক'রে চলে। সুনিপুণভাবে গোপন ক'রে চলে। কি যে ওর মনের গোপন কথা বুঝতে পরি না। সে সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছুই আমি বলতে পারি না। শুধু কচিৎ কখনও মনে হয়, আমাকে ও দয়া করতে চায়। আমার দেওয়া আশ্রয়কে ও দয়া ব'লে নিয়েছে। সেই দয়া ও আর একটা দয়া দিয়ে শোধ করবে ভেবেছে।

অবশ্য টুলুর সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছুই বলা যায় না। পৃথিবী-শুদ্ধ সবাই যদি ওর সম্বন্ধে ভুল করতে পেরে থাকে, আমার পক্ষেও ভুল করা বিচিত্র নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষ কতটুকু জানে? কতটুকু বোঝে? শুধু যা মনে হয় তাই বললাম! মনে হয়, টুলু বহুরূপী।

বলেছি তো, আকাশের শুকতারা নিজে থেকে নেমে এসেছিল। জাগিয়েছিল সুদুর্লভের কামনা। আমি তো নিজে থেকে কোনো দিন ওর নিভৃত সঙ্গসুখ কামনা করিনি। মনে আমার যাই থাক, কোনোদিন তো কোন ইচ্ছা মুখ ফুটে জানাইনি। কিন্তু মৌন মাটিতে বাণী যেই জাগল, সন্নিকটের বস্তুকে যেই করতলগত করতে চাইল, অমনি আকাশের শুকতারা চকিতে আকাশে গেল ফিরে, যে দুর্লভ সুলভ হ'য়ে উঠেছিল, সুদূর আকাশে সে আবার মিটি মিটি জ্বলতে লাগল, হাতের নাগালের বাইরে।

টুলুকে আমি দয়া করলাম কবে? অজয়ের মৃত্যুর পরে যেদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, দয়ার কথা সেদিন হয়তো মনে উঠেছিল। আর কোনোদিন নয়। টুলুকে আমি করব দয়া? দয়া ক'রে সেই রয়েছে আমার কাছে। আমি তো তার কাছে কিছুই চাইনি! সে নিজেই এসে ধরা দিয়েছে। আমার কেবলই সন্দেহ হচ্ছে, দয়া ক'রে সে ধরা দিতে চায়। তাই ধরা দিয়েও ধরা দিতে পারছে না! কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে করুণায়

মন দ্রব হয়। আবার মাঝে মাঝে সহজ অবস্থা ফিরে আসে। মনস্থির করতে পারে না। তখনই পিছিয়ে যায়।

আমার সম্বন্ধে ওর বোধ হয় ভয় ঢুকেছে। বুঝেছে আমার মধ্যে সাহস এসেছে। পুরুষচিত্তের দুর্জ্জয় সাহস! যাতে সে অসাধ্য সাধন করে, বাধাকে বাধা ব'লে মনে করে না, যে সাহস তাকে পশুর মতো নির্লজ্জ শক্তিতে বলিষ্ঠ করে। ভয় ওর এসেছে। একলা আমার সঙ্গে যাওয়ার সাহস আর নেই। কেবলই পিছুচ্ছে। রাধা শুদ্ধ সঙ্গে থাকলে পারে। তাহ'লে ওর ভালোই হয়। তখন ও নির্ভয়ে আমার চোখে স্বপ্ন রচনা করতে পারে, পারে তলহীন মোহের সাগরে ডুবিয়ে দিতে।

আমি জানি, টুলু আমায় আনন্দ দিতে চায়। এ বাড়ীতে এসে সেই হয়েছে ওর একমাত্র সাধনা। আমার শুষ্ক মুখ, দীপ্তিহীন চোখ সইতে পারে না। মনে ওর কি আছে ভগবান জানেন, কিন্তু বিরুদ্ধ যদি কিছু থাকেও আমায় আঘাত দিতে কিছুতে পারবে না। কিন্তু তাই বা স্পষ্ট বলে না কেন? দুঃখ? দুঃখ তো আছেই। তার হাত থেকে আমায় বাঁচাবে কে? তবু স্পষ্ট বলা উচিত। ও তো ভালোই জানে, লোভ আমার যত বড়ই হোক, নৃশংস নয়। মার্জ্জিত রুচির কল্যাণে সে লোভ সংযমের বাঁধন মানে।

নিতান্ত নিরাসক্তভাবে সে যেতে পারে চ'লে। যেন কিছুই হয় নি। আমার কথাটার যেন কোনো অর্থই নেই। কিন্তু আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। ওর কুসুমসুকুমার হাতের স্পর্শ আগুণের মতো সর্পিল গতিতে পৌঁছেচে অঙ্গুলের ডগা থেকে একেবারে মস্তিষ্কে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সর্ব্বদেহে। চোখের ঘুম নিয়েছে কেড়ে। বিছানায় কে যেন কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট ক'রে অবশেষে উঠতে হ'ল। একটা র‍্যাপার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বাইরে বেরুলাম। রাত দু'টোর কম নয়।

ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। শীতের জ্যোৎস্না চোখে কেমন মায়াপুরীর স্বপ্ন আনে। অসীম নিস্তব্ধতায় চাঁদের আলো যেন ছম্‌ ছম্‌ করছে। বাইরে বেরিয়ে আসতে মনে হ'ল এই যাতুর মধ্যে আমি যেন ডুবে গেলাম, হারিয়ে গেলাম!

ওদিকের পোড়া জায়গায় কি একটা গাছের নীচে অন্ধকাব যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। তার ওদিকের জীর্ণ বাড়ীটার নীচের ঘরের একটা জানালা আধখোলা। লণ্ঠনের আলোয় মনে হ'ল একটা ছেলে ছুলে ছুলে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে। ওর পরীক্ষা কাছে এসেছে।

সামনের খোলার বাড়ীর কচি বউটি উঠেছে এত রাত্রে। কলতলায় ব'সে ব'সে অতি দ্রুত বাসন মাজছে। নিস্তব্ধ রাত্রি, ওর চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। বোধ হয় ওর স্বামী মাতাল। কোথায় কোথায় ঘুরে একটু আগে ফিরেছে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় শুইয়ে ও নিজেও বোধ হয় এখনি খেল। সকালে হয়তো সময় হবে না, তাই বাসন ক'খানাও এখনি মেজে নিচ্ছে। কিম্বা স্বামী হয়তো মাতাল নয়। ভোরেই বোধ হয় কাজে বেরুতে হয়। পুরুষমানুষের পাতে তো আর নিতান্ত ভাতে-ভাত দেওয়া যায় না! ছু'খানা ভাজা, একটা তরকারী চাই। রাত্রের মাছ থাকে, তার একটা ঝোলও রেঁধে দিতে হয়। ছু'টোয় না উঠলে ওর হয়তো চলে না।

হঠাৎ তার পাশের বাড়ীর দোতালার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। শোনা গেল শিশুর কান্না। সঙ্গে সঙ্গে প্রহারের শব্দও শোনা গেল। এত রাত্রে ঘুম ভাঙতে ওর মা বোধ হয় বিরক্ত হয়েছে। প্রহার খেয়ে ছেলেটা আরও জোরে কেঁদে উঠল। ওর বাবারও গজ্‌ গজ্‌ বকুনির শব্দ পাওয়া গেল। কাকে বকছে কে জানে। ওর মাকেও বকতে পারে, ওকেও বকতে পারে। হড়াস্‌ ক'রে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। আবার তেমনি শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ হ'ল।

ছেলেটার শান্ত হ'তে সময় লাগল। ওর মাকে এই রাত্রে বোধ হয় ওকে কোলে ক'রে মেঝেয় পায়চারী করতে হ'ল। হাতেও বোধ হয় কিছু দিতে হ'ল। একখানা বিস্কুট, একটি মিষ্টি, কিম্বা একটা কিছু। খানিক পরে ছেলে ঘুমুল। আলো নিভল। চাঁদের আলোয় বাড়ীখানা আবার যেন ঝিমুতে লাগল।

আমাদের সুমুখের বাড়ীর বুড়ো ভদ্রলোকটি সমস্ত রাত কাশেন। ক'দিন থেকে তাঁর বাড়ীতে ডাক্তারের আনাগোনাও দেখতে পাচ্ছি। কিছু একটা কঠিন অসুখ ক'রেছে নিশ্চয়। বুড়ো মানুষ! এখন চোখ বুজলেই হয়। ঘরে তাঁর আলো জ্বলছে। সমস্ত রাতই জ্বলে। ভদ্রলোকের চোখে আর ঘুম নেই। থেকে থেকে কাশছেন। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বহুকাল। আর বিয়ে করেননি। একটিমাত্র ছেলে। কিছুদিন হ'ল মহাসমারোহে তার বিয়ে দিয়েছেন। তাদেরও চোখে ঘুম নেই। অফুরন্ত স্রোতে তাদের চলেছে কানে কানে কথা।

হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, তাদের কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হ'লাম। কথা শোনা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে টুক্‌রো টুক্‌রো হাসির আওয়াজ পাই। চুড়ির আওয়াজের মতো মিঠে মিঠে হালকা হাসি। মাঝে মাঝে কথা যেন স্পষ্ট হয়। কিন্তু তখনই বুড়ো ভদ্রলোকের কাশির শব্দে তা যায় ডুবে। ভদ্রলোকের ওপর রাগ হয়! একবার যেন একটু স্পষ্ট ক'রে শোনা গেল। মনে হ'ল বউটি যেন রেগেছে। ছিপ ছিপে, সুন্দরী একটি মেয়ে! মাঝে মাঝে জানালার পাশে অন্যমনস্কভাবে ব'সে থাকতে দেখেছি। ভাবতাম বাড়ীর জন্যে ওর বোধ হয় মন কেমন করে! সেই বউটি কি জানি কেন রাগ ক'রেছে। চুপি চুপি গদগদভাষা যেন তীক্ষ্ণ হয়েছে। অকারণেই সহানুভূতিতে ওর জন্যে মন ভ'রে উঠল। ছেলেটি কি যেন বললে। অনেকগুলি চঞ্চল পদের ধ্বনি শোনা গেল। বন্ধ জানালায় কিসের যেন ধাক্কা লাগল। এতদূরে

রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে থেকেও মেয়েটির জন্যে আশঙ্কায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলাম? আমি বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠতাম। কিন্তু তখনই বউটি খল খল করে হেসে উঠল। আমার বুকের ভেতরটা একবার চঞ্চল হ'য়েই শান্ত হ'ল। যাক্! মেয়েটি হাসছে।

বাইরের আকাশ তেমনি নীলাভ উজ্জ্বল। যেন কি স্বপ্ন দেখছে। পা টিপে টিপে তেতলায় গেলাম। টুলুর ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। জানালায় কান পাতলাম। টুলুর নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। নরম মসৃণ লেপের তলায় টুলু নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল নয়? কি যেন খস্ খস্ ক'রে উঠল? নিশ্বাস রোধ ক'রে কান পাতলাম। না, ও কিছু নয়। টুলু পাশ ফিরে শুল। টুলু ঘুমুচ্ছে।

শীতের বড় রাত্রিও ক্রমে ফুরিয়ে এল।

কুয়াশায় কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হ'ল পৃথিবীর ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙছে। অজগর সর্পের মতো এখনও সে এলিয়ে পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার বিপুল দেহের এখানে-সেখানে স্পন্দন জেগেছে। এইবার জাগবে।

কুয়াশায় জমাট অন্ধকার ভেদ ক'রে একটা ট্রাম ঘর্ঘর শব্দে ছুটে চলে গেল। তার পিছু পিছু একটা বাস। আর একটা। রাস্তায় জল দেওয়া আরম্ভ হ'য়েছে। একটা লোক মই কাঁধে ক'রে ছুটে ছুটে রাস্তার আলোগুলো নিভুচ্ছে। মোড়ের চায়ের দোকানটা এইবার খুলল। ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলোর ছুটোছুটি প'ড়ে গেছে। আঃ! বাঁচা গেল! ট্রাম-বাস-ময়লাফেলা গাড়ীর কর্কশ শব্দ কানে যেন মধুবর্ষণ করলে। বাঁচা গেল! রাত্রি শেষ হ'ল।

এই কুয়াশা যেন মহানগরীর ছড়ানো এলোচুল। এখন ধীরে ধীরে নিদ্রালস আঙুল দিয়ে জড়িয়ে নিচ্ছে।

সুমুখের বাড়ীর বউটির ঘুম ভেঙেছে। সে উঠে জানালাগুলো খুলে পর্দ্দাগুলো ঠিক ক'রে দিলে। চোখে তার অত্যন্ত মধুর রাত্রি জাগরণের কলঙ্করেখা! পর্দ্দা ঠিক করতে করতে নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি হেনে শিথিল কবরী ঠিক করতে করতে চঞ্চল পদে সে গেল বেরিয়ে।

ওদিকে খোলার বাড়ীর পাশের দোতলা বাড়ীর বউটি ছেলে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলে আর কাঁদছে না। বউটির স্নেহস্নিগ্ধ মুখে শীতের প্রভাতের শীর্ণ আলো এসে পড়েছে।

আর উঠেছে রাধা। চওড়া লাল পাড় একখানা মটকার শাড়ী প'রে স্নান সেরে উঠে আসছে। মাথায় কাপড় নেই। কলো এলোচুল পিঠের উপর গেরো দিয়ে বাঁধা। আমায় রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সিঁড়ির মুখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথায় কাপড় দিয়ে স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এত ভোরে যে!

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি শীতের দিনেও এত ভোরে স্নান কর?

রাধা মুখ নীচু ক'রে হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তার অনাবৃত মসৃণ বাহুতে বিন্দু বিন্দু জল তখনও জ'মে ছিল। রাধা পূজোর ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওর পূজোর পদ্ধতি অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। মন্ত্র আছে কি না জানি না। না থাকাও বিচিত্র নয়। আসবাবেরও হাঙ্গাম নেই। একটি ছোট কুশাসন: আর একটি পাথরের রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি।

রাধা কুশাসনখানি পাতলে। সাজিভরা ফুল ছিল, আপনমনে গুণ গুণ ক'রে কি গাইতে গাইতে মালা গাথতে লাগল। দু'গাছি মালা। একগাছি ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলে। আর একগাছি ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিজের গলায় পরতে যাবে এমন সময় দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। মালা আর পরা হ'ল না। হাতে ক'রে নিয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে হাসতে লাগল। আমি ভেতরে এসে বসলাম।

রাধা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখছিলেন অমন ক'রে ?

বললাম, তোমার পূজো।

—অমনি ক'রে ?

বললাম, ক্ষতি কি ? বললাম, বেশ লাগল তোমার পূজো। বেশী আড়ম্বর আমি ভালবাসি না।

রাধা নম্রভাবে একটু হাসলে। হাতের মালাটা দোলাতে দোলাতে বললে, নেবেন ? প্রসাদী মালা।

—দাও।

রাধা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে মুখ নীচু ক'রে হাসলে। রাধার ঠাকুরকে আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম।

বললাম, চমৎকার মূর্ত্তি তোমার ব্রজকিশোরের।

রাধা স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ব্রজকিশোরের মূর্ত্তিটি আর একবার দেখে নিলে। বললে, আসবার সময় গুরুদেব এটি দিয়েছিলেন।

এমন সময় টুলু এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল। কাঁধে একখানা তোয়ালে। স্নান করতে নামছে। হাতে দাঁত মাজার ব্রাশ। টুলু আমার গলার মালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

রাধা ডাকলে, এস।

টুলু আসছি ব'লে নীচে নেমে গেল। ওকে কেমন অবসন্ন দেখাচ্ছিল। একরাত্রির মধ্যে যেন শুকিয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণের হাসির আভাসটি গেছে মিলিয়ে।

ও যখন ফিরে এল আমি তখন আমার ঘরে এসে ব'সেছি। টুলু ধীরে ধীরে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

উদ্বিগ্নভাবে জিগ্যেস করলাম, তোমাকে বড় শুক্নো দেখাচ্ছে! অসুখ-বিসুখ....

বললে, ও কিছু নয়।

আমার এই ঘরটি টুলু প্রত্যহ ঝেড়ে মুছে দেয়। টুকিটাকি জিনিসগুলি যথাস্থানে সাজিয়ে রাখে। টুলু তাই করতে লাগল।

বললাম, আজকে সন্ধ্যায় সিনেমায় যাচ্ছি তো ?

টুলু যেন চমকে উঠল। বললে, আজ সন্ধ্যায় ? কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে বললে, সন্ধ্যেই তো হোক।

হেসে বললাম, সন্ধ্যে কি হবে না ভাবছ ?

বললে, যখন হবে তখন যাওয়ার ভাবনা। এখন কি ?

বললাম, এখন থেকে ঠিক করতে হবে না ?

টুলু মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, না।

৭

কাছারী থেকে একটু সকাল-সকাল ফিরলাম।

টিকিট আর কিনলাম না। ভাবলাম, রাধা যদি শেষ পর্য্যন্ত যেতে রাজি না হয়। কাছারী থেকে চিরদিন ফিরি নিঃশব্দে। আজকে সোরগোল তুললাম। সে শব্দে রাধা নেমে এল। তার পিছনে টুলু।

বললাম, এ কি! তোমরা এখনও সাজগোজ করনি? ছ'টা বাজে যে!

টুলু উত্তর দিতে পারলে না। নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। রাধা বললে, দিদিমণির বড্ড মাথা ধরেছে মৃণালবাবু। দুপুর থেকে।

চেয়ে দেখলাম, গ্রীষ্মের রোদে গাছের পাতা যেমন ঝলসে যায় ওর মুখখানি তেমনি গেছে ঝলসে। তাতে যেন একবিন্দু রস নেই।

বিরক্তভাবে বললাম, তবে তুমি কষ্ট ক'রে নেমে আসতে গেলে কেন টুলু? চুপ ক'রে একটু শুয়ে থাকলেই তো পারতে! ওই তো তোমার দোষ!

টুলু ভীতভাবে অপাঙ্গে আমার দিকে চাইলে। ওর মনে বোধ হয় ভয় হ'য়েছে আমার রাগের কারণ ঠিক ওর নীচে নেমে আসার জন্যে নয়, কারণ অন্য! কিছুটা আশাভঙ্গের জন্যেও হ'তে পারে। যাই কিছু সে ভাবুক, আমার বিরক্তি দেখে ও একটু ভয় পেলে। কোনোজবাব দিলে না।

টুলু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দেখে আমি আবার বিরক্তভাবে বললাম, যাও!

টুলু তথাপি গেল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, মিছিমিছি কাজ মাটি ক'রে ছুটে এলাম। রাধা, চা-টা কি তৈরি ক'রেছ নিয়ে এস। আমাকে এখনি আবার বেরুতে হবে!

রাধা যাচ্ছিল, টুলু তাকে বললে, তুমি থাক আমি আনছি।

বিস্ময়ে রাধাকে দাঁড় করিয়ে রেখে টুলু চ'লে গেল। রাধার সত্যিই বিস্ময়ের সীমা ছিল না! এই আকস্মিক রাগারাগির মধ্যে পড়ে সে হতচকিত হ'য়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে আমার ক্রোধের প্রকাশ সে কখনও দেখেনি। আজকে কেনই বা এমন অকস্মাৎ চটলাম, আর টুলুই বা এমনভাবে তাকে বসিয়ে রেখে নিজে কেন গেল খাবার আনতে, তার কারণ নির্ণয় করতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

টুলু খাবার নিয়ে এল। আমার খাওয়ার শেষ পর্য্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রাগ ক'রে চলেও গেল না, কথা দিয়ে হাসি দিয়ে আমার রাগ ভাঙাবার চেষ্টাও করলে না। আমিও নিঃশব্দে খাওয়া শেষ ক'রে উঠলাম। একবার কেউ প্রশ্নও করলে না কতদূরে যাচ্ছি, ফিরতে কত দেরী হবে।

আমি কিন্তু রাস্তায় নেমে বিপদে পড়লাম। কোথায় যাই? বহুকাল ক্লাবে যাইনি। সেখানে গেলে তো আস্ত রাখবে না। অকারণে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী যাওয়াও ছেড়েছি। বিনাকাজে এখন যেতে বাধ-বাধ ঠেকে। এক গড়ের মাঠে গিয়ে ব'সে থাকা। কিম্বা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গাড়ী-ঘোড়া মোটর-মানুষের ভিড় দেখা। ভিড় ভালো লাগছে না। রাস্তায় ঘোরা নয়, সিনেমাতেও যাওয়া নয়। বরং একটা ফিটনে ক'রে এমনি খানিকটা মাঠে হাওয়া খেয়ে ফিরে আশাই সব চেয়ে ভালো।

তাই করলাম। সামনে দিয়ে একটা খালি ফিটন যাচ্ছিল। সেইখানায় উঠে বললাম, ময়দান চল।

কাল সারারাত্রি চোখের পাতাটি বুজিনি। কাছারীতে কাজের

ভিড়ে ঘুমের কথা মনেও হয়নি। এখন ফিটনে উঠতেই শরীর ঘুমে যেন এলিয়ে এল। একটি কোণে ঠেস দিতেই রাজ্যের ঘুম নামল চোখে। খিদিরপুর পুলের কাছাকাছি গাড়োয়ান ডেকে তুললে, বাবু কোথায় যেতে হবে ?

বললাম, ময়দান ঘুরে বাড়ী।

ব'লেই আবার চোখ বন্ধ করলাম। সন্ধ্যার হাওয়ায় মাথাটা যেন সুস্থ বোধ হচ্ছিল। বেশ একটু শীত-শীত করছিল। কিন্তু সে বেশ ভালোই লাগছিল। এমন ঘুম অনেকদিন আসেনি। সমস্ত দুশ্চিন্তা কোথায় উড়ে গেল। মন হালকা বোধ হ'ল। পৃথিবীর সুখ দুঃখ, ভাবনা চিন্তা কিছুরই সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রইল না। নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলাম।

কতক্ষণের জন্যেই বা ঘুমিয়েছি। বাড়ীর কাছে যখন ফিরলাম ঘড়িতে দেখলাম দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। এই দু'ঘণ্টাতেই আমার শরীর মন হালকা হ'য়ে গেছে। মস্তিষ্কে যেন আর কোনো গ্লানি নেই টুলুর সম্বন্ধে আর আমার কোনো রাগ নেই। আশাভঙ্গের বিরক্তিও গেছে কেটে। বরং মনে মনে ওর জন্যে ব্যথিত হলাম, চিন্তিত হলাম, উদ্বিগ্ন হলাম। মনে পড়ল ওর মলিন মুখ।

টুলুর শরীর হয়তো কিছুকাল থেকেই ভাঙতে সুরু করেছে। আমিই ওর দিকে চাইবার সময় পাইনি। আমার চিত্ত থেকে আমার স্বপ্ন থেকে যে আনন্দরস উৎসারিত হচ্ছিল তাই নিয়ে ছিলাম ডুবে। এতদিন নিজেকে নিয়েই ছিলাম ভুলে। অন্যের দিকে চাওয়ার অবকাশ হয়নি। মনে হ'ল টুলুর শরীর নিশ্চয়ই কিছুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। একদিনে হঠাৎ একটা লোক এমন শুকিয়ে যায় না, কারও এমন ক'রে ফিটও হয় না। মনে মনে লজ্জিত হলাম, অনুতপ্ত হলাম। বেচারা টুলু। ওর ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন।

রাধা এসে বললে, আপনার খাবার যায়গা করি ?

—কর।

রাধা খাবার দিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

জিগ্যেস করলাম, টুলু কেমন আছে?

বললে, তেমনি।

সন্ধ্যার কাণ্ডে রাধাও যেন ভড়কে গেছে। সেও যেন কেমন ভয়ে ভয়ে কথা বলছে। কৃতকর্ম্মের জন্যে বড়ই লজ্জিত হলাম। ওরা হয়তো ভাবছে দু'মুঠো খেতে দিচ্ছি ব'লেই এমন ক'রে চোখ রাঙাতে সাহস করছি। আমি যেন ওদের মাথা কিনে নিয়েছি।

ব্যাপার লঘু করার জন্যে বললাম, তোমরা সবাই আমার ওপর খুব রেগে গেছ, না রাধা?

রাধা শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

বললাম, তুমি হয়তো রাগনি, কিন্তু টুলু রেগেছে। বলে নি কিছু?

রাধা বললে, না। বলবে কি?

বললাম, বলেনি হয়তো, কিন্তু রেগেছে নিশ্চয়। নইলে আমার খাওয়ার সময় নীচে একবার নামতো।

রাধা ব্যস্তভাবে বললে, বা রে! ওকে শুয়ে থাকতে বলেছেন যে! নীচে আসতে নিষেধ করেন নি?

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠলাম। ও, এইজন্যে?

রাধা ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আর কিছুতে না হ'লেও তোমাদের চেয়ে আমি বয়সে বড়। যদি কখনও কিছু বলেই ফেলি, কিছু মনে কোরো না রাধা। দুঃখ শুধু তো তোমাদের নয়, আমারও আছে।

এমন সময় টুলু ধীরে ধীরে নেমে এল। তার দিকে না চেয়েই বলতে লাগলাম, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে তিনটি অভাগ্য প্রাণীকে ভগবান এক জায়গায় জড় ক'রেছেন। আমাদের দিকে সমস্ত পৃথিবী পিছন ফিরেছে। এই কথা ভেবে আমাদের দোষ-

ত্রুটি আমরা যদি না ক্ষমা করতে পারি, বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না।

টুলু আমার এ সব কথা শুনছিল ব'লে মনে হ'ল না। আমার প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে রাধাকে বললে: চাট্‌নি করনি?

—ক'রেছি বৈ কি! ওই যাঃ।

রাধা চাট্‌নি আনতে গেল। টুলু দুধের বাটিতে একটু চিনি ঢেলে বাতাস করতে করতে বললে, রাগের কথা কি হচ্ছিল শুনি?

বললাম, হয়নি কিছুই। তুমি আমার ওপর রেগেছ তাই বলছিলাম।

বললে, সমস্ত দিন কোর্টে ব'সে হয়কে নয় করেন সেই ভালো। অকারণে রাত্রিবেলায় মিথ্যে কথা বলছেন কেন?

বললাম, মিথ্যে বলিনি তো।

টুলু আর একটা বাটিতে দুধটা ঢালতে ঢালতে বললে, তা হবে। পুরুষমানুষের দস্তুরই তাই। গরীবের ওপর অকারণে চোখও রাঙাবেন আবার দোষও চাপাবেন।

রাধা চাট্‌নি নিয়ে এল। টুলু তাকে বললে, তুমি একটা ভয়ানক অন্যায় ক'রেছ রাধা।

রাধা এই আকস্মিক দোষারোপে ভয় পেয়ে গেল। বললে কি করেছি?

—তুমি মৃণালবাবুর ওপর রাগ করেছ?

রাধা হেসে বললে, কখন রাগ করলাম?

হাসি চেপে টুলু বললে, করনি? সেই! সন্ধ্যাবেলায় বলছিলে যে। বলে দোব?

—দাও ব'লে।

ওরা দুজনেই হেসে উঠল। টুলু দুধের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, আমরা দুজনেই ভীষণ রেগেছি। আমাদের

রাগকে যদি ভয় করেন তাহ'লে পাতে কিছু ফেলে রাখতে পারবেন না। আমি আপনার বিছানাটা করতে চললাম। বুঝলেন?

টুলু কি আমাকে কিছু ইঙ্গিত ক'রে গেল? ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম। মুখ দেখা গেল না। ও যেন ইচ্ছে ক'রেই আমাকে আড়াল ক'রে চলে গেল। টুলুর রহস্য আমার কাছে দিন দিন বেড়েই চলছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমি বিছানায় চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। আমার মনে ধারণা হ'য়েছিল, টুলু আসবে। বিছানা করার কথায় ও সেই ইঙ্গিতই নিশ্চয় ক'রে গেছে। ওর জন্যে আমার দুয়ার খুলে রাখলাম। কোথাও একটু কিছু শব্দ হ'লেই চমকে উঠি। দেহের রক্ত দ্রুততালে নেচে ওঠে। কিন্তু টুলু এল না।

সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেল। নীচে বাসন মাজার শব্দ বন্ধ হ'ল। ব'সে ব'সেই শুনছি রাধা ঝিকে বিদায় ক'রে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। নীচের আলো নিভল। তারপর তেতলা যাওয়ার সিঁড়িতে রাধার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। এক সময়ে মনে হ'ল, রাধা তেতলার বারন্দায় দ্রুতপদে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় বাইরে কাপড় মেলা আছে সেইগুলো তুলছে। কিম্বা হয়তো অন্য কিছু বাইরে প'ড়ে রয়েছে। অবশেষে সে শব্দও মিলিয়ে গেল। রাধার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হ'ল। এইবার সে আসবে।

সে বলেছে আমি তার সকলের চেয়ে আপন। বলেছে সবাই যখন অবলীলাক্রমে তাকে অমর্য্যাদার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তখন আমি দিয়েছি আশ্রয়। এ কি শুধুই আশ্রয়! আমি তার সমগ্র সত্ত্বাকে সম্মানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি। ও নিজে মুখ ফুটে দুঃখ করেছে। কেন আমি দ্বিধা করি? কিসের জন্যে সঙ্কোচ? পুরুষের মনের কথা টের পেতে মেয়েদের এক মিনিটও লাগে না। সে

বুঝেছে আমার প্রেম কারও প্রেমের চেয়ে ছোটও নয়, দুর্ব্বলও নয়। আমার বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় রমণীর পক্ষে উপেক্ষা করবার নয়। সে আসবে।

টুলুর সম্বন্ধে সুকোমলের মন এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। এখনও সন্দেহ আছে। এখনও দুলছে। টুলু জানে, ওর ওপর এখনও নিঃসংশয়ে নির্ভর করা চলে না। টুলুর মর্য্যাদা ওর হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। ও নিজে যেচে এসেছে সত্যি। একবার বললেই হয়তো ওকে নিয়েও যাবে। কারণ, ওকে ঘরে রেখে ও যেমন স্বস্তি পাচ্ছিল না, ওকে ছেড়েও ওর পক্ষে থাকা অসম্ভব। টুলুকে যে ও ভালবাসে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সে ভালোবাসা কণ্টকসঙ্কুল। কোমলচিত্ত নারীর পক্ষে সে কাঁটার জ্বালা সহ্য করা সহজ নয়। তা সে পারবে না। টুলু সুনিশ্চিত আসবে।

টুলু আসবে এই সম্ভাবনাতেই আমার ছোট ঘরটির রূপ গেছে বদলে। ছোট নীল আলো জ্বলছে। তার স্বল্প আলায় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। ঘরখানিকে যেন নীল দিয়ে মেজে দিয়েছে। রোজ জ্বলে এই আলো। কিন্তু এমন ভালো কোনদিন লাগেনি।

নীচের বড় ঘড়িটায় ঢং করে একটা বাজল। কত এখন রাত? এরই মধ্যে একটা হবে? কি ওটা আধঘণ্টার ঘণ্টা? কতক্ষণ থেকে প্রতীক্ষা ক'রে আছি জানি না। হয়তো অনেকক্ষণ। যুগযুগান্ত থেকে। কিম্বা হয়তো এই এখনি থেকে। সময়ের হিসাব মন থেকে গেছে মুছে। যে কাল অনন্ত, যাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করা চলে না, আমি চলেছি তারই মধ্যে দিয়ে। দণ্ডের সঙ্গে পল আশ্চর্য্যরকভাবে মিলে সমান হ'য়ে গেছে।

ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা। আমার স্বপ্ন গেল টুটে। ঘণ্টাতো নয় যেন একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। কই এল? টুলু কই এল? সেই থেকে ব'সে রয়েছি, এল না তো?

ঘরের কোণে কোথায় একটি ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছিল একঘেয়ে সুরে। সে সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল একেবারে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে। তার মধ্যে হতাশার সুর ছিল বুঝি। আমাকে আর ব'সে থাকতে দিলে না। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগমাম।

মাথার ভিতর কি রকম যন্ত্রণা হচ্ছিল। ঘরের আলো মনে হ'ল পর্য্যাপ্ত নয়। এদিকের দেওয়াল থেকে ওদিকের দেওয়ালের ছবি ভালো দেখা যায় না। কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না। সব ঝাপসা। ঘর যেন গরম হয়ে উঠেছে। চারিদিকের জানালা দরজা সব বন্ধ। মাথা ঝিম ঝিম করছে। হাত কাঁপছে। ভয় হ'ল, এ ঘরে আর বেশীক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। মুক্ত হাওয়ার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠলাম।

আমি বাইরে বার হ'লাম।

সেই কালকের মতো আলো।

খোলার ঘরের সেই বউটি উঠেছে আজও। পাশের দোতলার খড়খড়ির ফাঁক্ দিয়ে আজও দেখা যাচ্ছে আলো। কিন্তু খোকাটি বোধ হয় আজ আর কাঁদেনি। মায়ের কোলের মধ্যে চুপটি ক'রে ঘুমিয়েছে। বুড়ো ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে কাশছেন। আর তারই পাশের ঘর থেকে মৃদুগুঞ্জন আসছে ভেসে। চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ নিশীথে এই ক'টি প্রাণীর চোখে নেই ঘুম। আর ঘুম নেই মোড়ের পাহারাওয়ালার নেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের। আর নেই আমার।

কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে আর আমি থাকব না। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ সবলে আমায় দূর ক'রে ফেলতে হবে। যা কিছু হয় হোক, সেই সঙ্গে এই সংশয়সঙ্কীর্ণ, আশা-নিরাশায়ভরা পথে চলাও হোক

শেষ। আমি তেতলায় টুলুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘর বন্ধ, কিন্তু ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। খাটের উপর টুলুর নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। সে কি তবে জেগে আছে এখনও?

দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলাম।

হাঁ, টুলু জেগেই আছে। খাট থেকে সে বোধ করি নামল। দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এক মুহূর্ত্তে অবশ হ'য়ে গেল। ইচ্ছে হ'ল টুলু দরজা খোলার আগেই ছুটে পালাই। সেই মুহূর্ত্তেই ও দরজা খুলে শান্তকণ্ঠে বললে, আসুন।

আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে খাটের উপর বসতে ব'লে ও মেঝেতেই বসল। দরজার পাশে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে। ওদিকের খাটে বাধা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

টুলু হেসে বললে, অনেকদিন বাঁচবেন।

টুলুর হাসি দেখে আমি অনেকটা সাহস পেলাম। বললাম, এমন আশঙ্কা কেন করছ?

খোলা দরজা দিয়ে হু হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। দরজা বন্ধ ক'রে টুলু আবার নিজের জায়গায় এসে বসল। বললে, এই মুহূর্ত্তে আপনার কথা ভাবছিলাম।

বললাম, আমার সৌভাগ্য। প্রসঙ্গটা কি?

কাপড়ের পাড়টা সমান করতে করতে ও বললে, অনেক ভেবে দেখলাম মৃণালবাবু, আপনার কথাই ঠিক।

ওর গাম্ভীর্য্য দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, এর জন্যে তো অনেক ভাববার প্রয়োজন ছিল না। কথা আমি প্রায়ই ঠিক বলি। কিন্তু কথাটি কি?

টুলু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, আপনি ওখানকার ঠিকানা জানেন?

—কোনখানকার?

টুলু মুখ নীচু ক'রে বললে, আবার কোনখানকার? আপনার

বন্ধুর। ও কি পরিহাস করছে?—বললাম, জানি। সেখানে কি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে?

ও হেসে বললে, না। অতটা সহজ নয়। একখানা চিঠি লিখতে হবে।

—কি লিখবে?

—লিখব শ্রীচরণকমলেষু।

বললাম, তুমি কি পরিহাস করছ?

ঘাড় নেড়ে বললে, না।

—সেখানে যাওয়ার অর্থ কি জান?

এবারও নতমুখে ঘাড় নেড়ে জানালে, জানে।

—তবে যেতে চাও কেন? মিথ্যে বোলো না টুলু, আমি সত্যি কথা শুনতে চাই।

টুলু ম্লান হেসে বললে, কি হবে সত্যি শুনে? বরং ঠিকানাটা কখন দিচ্ছেন বলুন।

—কখনই দোব না। কেন দোব? কী আমার লাভ?

—একবার না হয় নিঃস্বার্থ হ'লেন।

উত্তেজিতভাবে বললাম, একবারও হব না। টুলু, রাত্রে আমার নিদ্রা নেই। নিজের বাড়ীতে সমস্ত রাত চোরের মতো ঘুরে বেড়াই। আমার দুঃখ তুমি যদি না বোঝ, তোমার দুঃখ আমি কেন বুঝব?

টুলু আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিল না। মৃদুকণ্ঠে বললে, কে বললে বুঝি না?

—কিছুই বোঝ না। আমি তো কোনদিন বলিনি।

—সবই কি বলতে হয়? আমরা পুরুষের চোখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারি।

ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে বললাম, বোঝ যদি তবে কেন যেতে চাও? আমার স্নেহ কি এতই অকিঞ্চিৎকর?

টুলু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, অকিঞ্চিৎকর নয় বলেই যেতে চাই মৃণালবাবু, আমাকে বিদায় ক'রে আপনি বাঁচুন। এ ছাড়া আপনার আর বাঁচবার পথ নেই।

—পথ নেই? আমি কি মিথ্যের পেছনে ছুটলাম এতদিন?

—মিথ্যে কিছুই নয়। আপনি আলেয়ার পেছনে ছুটলেন। আলেয়া আলেয়া, গৃহের মঙ্গলদীপ নয়।

আমার কপালের রগ দপ্ দপ্ করছিল। মাথা শূন্য বোধ হচ্ছিল। ডান হাতে কপাল টিপে টিপে ধ'রে ব'সে রইলাম।

টুলু শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনাকে দুঃখ দিয়ে আমি যে কত দুঃখ পেলাম, সে আর বোঝাবার চেষ্টা করব না। এ পৃথিবীতে আপনার চেয়ে আপন আর আমার কেউ নেই। তবু দুঃখ দিতে হ'ল। ঠকানোর চেয়ে সে ভালো।

—ঠকাবেই বা কেন?

—আর কি করব? আমার দেবার আছে কী?

ওর কথা বুঝতে দেরী হচ্ছিল। এতক্ষণে যেন একটু খেই ধরতে পারলাম? বললাম, কিছুই নেই? কিচ্ছু নেই? সব দিয়ে ব'সে আছ?

টুলু উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করলে না। চুপ ক'রে রইল।

বললাম, তবে তুমি কেন সেদিন অত ক'রে আশা দিলে?

টুলু ধীরে ধীরে বললে, ভুল ক'রেছিলাম।

—ভুল ক'রেছিলে? এত দিন ধ'রে কেবলই ভুল ক'রে গেলে?

টুলুর মুখে ঠিক কথাটি কিছুতে যোগাচ্ছিল না। নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, আপনার অসীম স্নেহের বদলে আমি কিছু করতে চেয়েছিলাম।

বললাম, শুধু এই? আর কিছু না? আমাকে তোমার কিছু ভালো লাগে নি?

এবারে টুলু চোখ তুলে চাইলে। মুখখানি ওর আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। বললে, ভালো লাগে নি? খুব ভালো লেগেছিল। আপনাকে আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

দু'জনেই যে কথা বলতে চাই, তা কেবলই জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। স্পষ্ট ক'রে বলবার ভাষা কিছুতে মুখে যোগাচ্ছিল না।

সমস্ত সঙ্কোচ এই প্রথম এবং শেষ বারের জন্যে সবলে দূরে ফেলে দিয়ে বললাম, ভালো লাগার কথা ভুল ব'লেছি টুলু, বলতে চেয়েছিলাম, ভালো বাসার কথা। না, না, এর উত্তর তোমাকে দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই। আমি জানি, আমি অনধিকার-চর্চ্চা করছি। এ শুধু আমার কৌতূহল। ইচ্ছে করলে এ প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পার।

টুলু এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে বললে, নিজের সম্বন্ধে কিছু করার অধিকার আমার নেই। আমি আর কি বলব? আমার এ অপরাধ ক্ষমা করবেন।

—ক্ষমা সব অপরাধই একে একে করতে হবে। কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন আমায় অমন ক'রে জয় করলে? কী প্রয়োজন ছিল? বেশ তো ছিলাম।

টুলু জবাব দিলে না।

বললাম, বল।

বিব্রতভাবে বললে, ও কথার উত্তর চাইবেন না। বললাম তো ভুল ক'রেছি।

জেদ ক'রে বললাম, না, পাশ কাটালে চলবে না। উত্তর দিতেই হবে। বল, কেন এমন করলে?

বললে, কি ক'রেছি জানি না। কিন্তু আপনাকে জয় করার লোভ সামলান যে-কোনো মেয়ের পক্ষে কঠিন। যা করেছি, নিজের অজ্ঞাতসারে করেছি। করেছি স্বভাববশে।

শ্লেষের হাসি হেসে বললাম, তোমার এই কথাটি আমিও

চিরকাল মনে রাখব টুলু। মনে রাখব, একটি মেয়ের পক্ষেও আমাকে জয় করার লোভ তুর্জ্জয় হ'য়ে উঠেছিল। একটি মেয়েও আমাকে তার খেলার যোগ্য মনে ক'রেছিল। কিন্তু যাবার বেলায় ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছুই কি তোমার দিয়ে যাবার মতো ছিল না?

—ফাঁকা কথা!—টুলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—তা হবে। অপরাধ করেছি, শাস্তি তার নিতেই হবে। কিন্তু যাবার বেলায় আপনিও কি শুধু আমায় শাস্তিই দেবেন? কেন যে চলে যাচ্ছি, একবার ভেবে দেখবেন না?

টুলু ভালো ক'রে মুখ তুলে চাইলে। ওর বাষ্পসমাকুল চোখ আলোয় জ্বল জ্বল করছে। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। তবু নিষ্ঠুর হ'য়ে বললাম, কি হবে ভেবে? কি লাভ?

টুলু তখনও এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। কিছু উত্তর দিলে না।

বললাম, তুমি গেলে সত্যিই আমি বাঁচব টুলু, বেঁচে যাব। আমি আগেই তো পাঠাতে চেয়েছিলাম। তুমিই ইচ্ছে ক'রে যাও নি।

টুলু চুপ ক'রে রইল।

বললাম, কিন্তু বেশী দয়াও ভালো নয়। তাতে ঠকতে হয়। এবারে আমি কিছুতে তোমায় পাঠাতাম না। জোর ক'রেই আটকে রাখতাম। যদি না···যাক্‌গে সে কথা।

টুলু তথাপি চুপ ক'রে রইল।

এতক্ষণ খেয়াল করি নি। চেয়ে দেখি, রাধা উঠে বসেছে বিছানার উপর। অবাক হ'য়ে আমাদের কথা শুনছে।

আমি উঠেত উঠতে বললাম, আর আমার কিছু জিগ্যেস করবার নেই। আমি উঠলাম। কাল সকালে ঠিকানা নিও আমার কাছে।

৮

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা কাছারী থেকে ফিরে এসে দেখি সুকোমল আমার বাইরের ঘরে বসে রয়েছে। একা।

জিগ্যেস করলাম, এই যে! কতক্ষণ এসেছ?

সুকোমল প্রথমে বললে, এই মাত্র। তারপর বললে, অনেকক্ষণ এসেছি। তোমার জন্যে ব'সে আছি।

বললাম, পোষাকটা ছেড়ে আসি? না, তাড়াতাড়ি আছে? গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছ?

সুকোমল বললে, পাঠাই নি। আমি বলছিলাম কি···

বললাম, ফিরে এসে তোমার বক্তব্য শুনছি।

বাইরে পর্দ্দার আড়ালে টুলু দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বাইরে আসতেই চকিতে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না। বাথরুমে গেলাম। ফিরে এসে বসতেই রাধা দুজনের খাবার দিয়ে গেল।

বললাম, একটু চা খাও সুকোমল।

—এই খেয়ে এলাম।

হেসে বললাম, এই আর কি ক'রে খেলে? এসেছই তো অনেকক্ষণ। খাও, খাও, একটু মিষ্টিমুখ করতে হয়। তারপর? কি যেন বলছিলে?

সুকোমল বিস্মিতভাবে বললে, আমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ? টুলুকে নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে?

—ও! বলছিলাম, আজকে দিনটা ভালো আছে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে···

বললাম, বেশ! বেশ! পাঁজি দেখলে না কি?

সুকোমল গম্ভীরভাবে বললে, পাঁজি না দেখে এক পাও চলি না আজকাল। তোমার মনে নেই টুলুকে কি অদিনে দেশ থেকে নিয়ে আসি? তার ফল আজও ভুগছি। সেই থেকে···

বললাম, না, পাঁজি মানা ভালো। তা বেশ তো, আটটার মধ্যেই নিয়ে যাবে। এখন সাতটা। আর একঘণ্টা। কিন্তু এর মধ্যে কি খাবার হবে?

সুকোমল তাড়াতাড়ি বললে, না, না, তার অসুবিধা হবে না। আমার বাসাতে গিয়েই হবে। দূরের রাস্তা তো নয়।

—তা অবশ্য নয়। তবে এতদিন রইল টুলু, যাওয়ার দিন না খেয়ে যাবে?

বাইরে থেকে কে যেন রাধাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে। রাধা বললে, খেয়ে যাবে না তো কি? আমার সমস্ত রান্না হ'য়ে গেছে।

বললাম, হ'য়ে গেছে? বেশ, বেশ। তাহ'লে সুকোমলের খাবার জায়গা ক'রে দাও বরং। সময়ও তো নেই। কি বল?

রাধা জিগ্যেস করলে, সেই সঙ্গে আপনার জায়গাও কি ক'রে দোব?

—আমার এখন থাক। এত সকাকে আমি খেয়ে কি করব? হেসে বললাল,—আমাকে তো আর যাত্রা করতে হবে না? তাই যাও সুকোমল, ইতিমধ্যে আমিও ক'টা জরুরী কাজ সেরে ফেলি। এ ক'দিনে অনেক ক্ষতি ক'রেছি।

শেষের কথাটা একটু জোরেই বললাম।

সুকোমল চলে গেল। আমি একটা মামলার নথি নিয়ে বসলাম। মনে হ'ল দ্বারের পর্দ্দার পাশে কে যেন এসে দাঁড়াল। একটুখানি শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ উঠল। চুড়ির আওয়াজ। কিন্তু আমার সময় কই? অনেক সময় নষ্ট ক'রেছি, অনেক ক্ষতি সয়েছি। আর নয়।

দ্বারের পর্দ্দা স'রে গেল। শাড়ীর শব্দ আরও কাছে এল। একেবারে আমার পাশে।

বললে, তবু রাগ ক'রে থাকবেন? আমার প্রণামও কি নেবেন না?

টুলু এমনিতেই যথেষ্ট সুন্দরী। কিন্তু আজকে যেন বিশেষ ক'রে সাজ করেছে। মেয়েদের সাজ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা সাধারণের চেয়ে একটু বেশী। সুতরাং বেশের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম। মনে হ'ল এতদিনের মধ্যে এমন নিখুঁত ক'রে নিজেকে সাজাতে আর কোনো দিন দেখিনি। এমন পরিপাটি ক'রে কেশও কোনোদিন বাঁধেনি।

আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ও লজ্জিত হচ্ছিল, সঙ্কুচিত হচ্ছিল। চোখ নামিয়ে বললে, প্রণাম করতে এলাম।

টুলু প্রণাম করতে এসেছে! আজকে যাবে কি না! তাই।

আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে টুলু উঠে দাঁড়াল। বললে, অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম···

বাধা দিয়ে বললাম, দুঃখের কথা থাক। সুকোমলের সঙ্গে কথা হ'ল?

ও ঘাড় নেড়ে জানালে, হ'ল। মুখে বললে, দেখলেন তো উনি কি হ'য়ে গেছেন?

সুকোমল রোগা হ'য়ে গেছে। ওর মস্তিকেরও স্থিরতা নেই। আর আমি? থাক্ আমার কথা।

বললাম. ওর মনে সন্দেহ আর নেই তো? একেবারে গেছে?

ও হাসলে। বললে, ও বিষ কি একেবারে যায়?

—তাহ'লে?

টুলু আবারও সুন্দর ক'রে হাসলে। বললে, কি করব তাহ'লে? আত্মহত্যা তো আর করতে পারি না!

বাইরের দিকে চেয়ে নিরাসক্তভাবে বললে, দু'দিনে স'য়ে যাবে।

নথির দিকে মনঃসংযোগ ক'রে বললাম, স'য়ে গেলেই ভালো।

টুলু অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলের কোণ খুঁটতে লাগল। বললে, কোনো রকমে সুখে-দুঃখে ঘর করা। শতকরা নিরেনব্বুইজন স্বামী-স্ত্রী যা করে।

আমি উত্তর দিলাম না। ওরা স্বামী-স্ত্রী যেমন ক'রেই ঘর করুক তাতে আমার কথা বলবার কি আছে? আমি সেখানে নিতান্তই তৃতীয় ব্যক্তি।

টুলু হেসে বললে, আজ সমস্ত দিন ধ'রে ঘোমটা দেওয়া প্রাক্‌টিস করলাম, জানেন? চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করব।

নথি থেকে চোখ না তুলেই বললাম, কাকেই বা লিখবে?

টুলু সে খোঁচা নিঃশব্দে হজম ক'রে বললে, রাস্তার দিকের বারান্দায় কোনোদিন দাঁড়াব না। ঘরের জানালা খুলে রাখব না, জোরে জোরে হাসব না, ছাদে যদি কোনো প্রয়োজনে যেতেই হয় হামাগুড়ি দিয়ে যাব,—যাতে কেউ দেখতে না পায়। সাহিত্যচর্চ্চা তো ছেড়েই দিয়েছি। সময়ে সময়ে যাও দু'একখানা বই খুলি আর খুলব না। ব্যস, হাঙ্গাম চুকে গেল।

টুলু ফিক ফিক ক'রে হাসতে লাগল।

আমি জানি ওর মনের কোনখান থেকে একথা বার হচ্ছে। নথি থেকে মুখ তোলবার উপায় ছিল না, পাছে টুলু আমার চোখে জল দেখে ফেলে।

বললাম, সুকোমলের খাওয়া হ'য়ে গেল বোধ হয়। তুমিও সেরে নাওগে। সময় সঙ্ক্ষেপ।

—হ্যাঁ, যাই।

ব'লে টুলু আরও কি যেন বলবার জন্যে একটু ইতস্তত করলে। শেষ পর্য্যন্ত বলতে আর পারলে না। না বলে চলে গেল।

৯

যাওয়ার আগে টুলু আর একবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তার তেতলার ঘরে। ওর চোখে দেখেছিলাম জল। যেন নববধূ প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। ওর যাওয়া ক্ষণে ক্ষণে আমাকে ওর বিয়ের দিনটির কথা স্মরণ করে দিচ্ছিল। কিন্তু তফাৎ আছে। সে দিনের সঙ্গে এ দিনের অনেক তফাৎ!

ওর যাওয়ার পালা আরও সহজ করতে পারত। চলে যেতে পারত নিঃশব্দে। হয়তো তার জন্যে চেষ্টাও করেছে। মনে হয়, যতই চেষ্টা করেছে, সমারোহ ততই গেছে বেড়ে।

যাওয়ার সময় প্রণাম ক'রে ব'লেছিল, চললাম তো মৃণালবাবু, কিন্তু বড় ভয় করছে।

সাহস দিয়ে ব'লেছিলাম, ভয় কি? অপরিচিত তো কিছুই নয়।

—কি জানি। তবু জেনে যাই, আবার যদি কোনোদিন আসতেই হয়, দুয়ার খোলা পাব তো?

ব'লেছিলাম, পাবে। আমার দুয়ার তোমার জন্যে সর্ব্বকাল খোলা থাকবে।

টুলু আর কিছু বলেনি। আবক্ষ গুণ্ঠন টেনে স্বামীর পিছু পিছু গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। তার মনে কি হচ্ছিল ভগবান জানেন। মুখ দেখতে পাইনি।

রাত্রে রাধা আমায় খেতে দিয়ে কত কাঁদলে। ক'লকাতা এসে পর্য্যন্ত এক মিনিট টুলুকে ছেড়ে থাকেনি। এই রাত্রে একা থাকতে হবে ভাবতেও তার ভয় হচ্ছে। টুলুর বাসা কি অনেক দূরে? রাধা

বার বার প্রশ্ন করলে, সেখানে মাঝে মাঝে যাওয়া যাবে তো? যেদিন যাবে সেদিনই ফিরে আসা চলবে তো? সে কি সহরের ভেতরেই?

আশ্বাস দিয়ে বললাম, টুলু কাছেই রইল, দূরে যায়নি। তোমার যখন ইচ্ছে হবে গিয়ে দেখা ক'রে আসবে। বড় জোর আধ ঘণ্টার রাস্তা।

রাধা বললে, এ বাড়ী ফাঁকা হ'য়ে গেল মৃণালবাবু। আমি তো হাঁফিয়ে উঠব।

বললাম, দুঃখ ক'রে কি করবে রাধা? পরের বউতো আর ধ'রে রাখা যায় না।

রাধা চুপ ক'রে রইল। এতদিন কিছুই সে ভাবেনি, বোঝেও নি। টুলু কোনোদিন চ'লে যেতে পারে, বিশেষ নিজের ইচ্ছায়, এমন সম্ভাবনার কথাও তার মনে উদয় হয়নি! উদয় হ'য়েছে সবে কাল, কাল রাত্রে। বুঝেছেও সমস্ত। অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত গ্রাম্য প্রকৃতির হ'লেও মেয়েমানুষ তো! না বুঝে পারে না! টুলুর চ'লে যাওয়ার হেতু সম্পূর্ণভাবে না বুঝলেও অনেকটা নিশ্চয়ই বুঝেছে।

রাধা আমার পাতের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে বললে, আপনার আজ কিছুই খাওয়া হ'ল না। টুলু নেই!

আমি সস্নেহ পরিহাসে বললাম. টুলু কি আমাকে হাতে ক'রে খাইয়ে দিত? বেশ খাওয়া হ'য়েছে।

রাধা সে কথা শুনতেই চাইলে না। বললে, এখন থেকে আপনার অনেক কষ্টই হবে।

জিগ্যেস করলাম, একথা বলছ কেন?

বললে, টুলু নেই। আমি কি তার মতো যত্ন করতে পারব?

হেসে বললাম, কাজ কি তার মতো যত্ন ক'রে? তুমি তোমার মতো যত্ন কোরো, তাহ'লেই আমার খুব হবে।

রাধা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, তাছাড়া আর উপায় কি ? দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে হবে।

বললাম, যা বরাত ! ঘোলই বা মেলে কই ?

রাধা আমার দিকে পেছন ফিরে কি একটা করতে করতে বললে, ভগবানকে ডাকলে ভগবান মেলে। ঘোল মিলবে না ?

উঠতে উঠতে বললাম, এবার থেকে ঘোলকেই ডাকতে আরম্ভ করলাম, দেখি মেলে কি না।

রাধা আর জবাব দিলে না, আপনার মনে কাজ করতে লাগল।

অনিদ্রা বুঝি বা রোগেই দাঁড়ায় !

আহারান্তে আবার নথি নিয়ে বসলাম। ভালো লাগে না। একখানা বই নিয়ে পড়তে লাগলাম। কি যে পড়ি কিছুই বুঝি না। অক্ষরগুলো চোখে পড়ে, কিন্তু তার অর্থ আর মস্তিক পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। সেখানে স্থান নেই। নানা এলোমেলো চিন্তায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত। তবু পাতার পর পাতা উলটে যাই।

রাধা ক'বারই এসে তাগাদা দিয়ে গেছে শুতে যাওয়ার জন্যে। আমার জন্যে ওরও চোখে ঘুম নেই। ও তো জানে না শুতে যাওয়া আমার পক্ষে নিস্ফল। চোখে কিছুতে ঘুম নামবে না। রাধা বললেও না। কিন্তু রাধার বার বার তাগাদায় অবশেষে বই বন্ধ করে উঠতে হল। শোবার ঘরে এসে আজকে আর নীল আলোটা জ্বাললাম না। শুধু পায়ের দিকের জানালাটা দিলাম খুলে। বাইরে আজও অফুরন্ত জ্যোৎস্না। কিন্তু জানালা দিয়ে আমার ঘরে তার এক ফোঁটাও এল না। আমি অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বাইরের জ্যোৎস্নালোকের দিকে চেয়ে রইলাম। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে মাঝে মাঝে চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে। তবু চেয়ে থাকি। কি করব ?

ঘুম যে আসে না। কিছুতেই ঘুম আসে না।

আমার খোলা জানালার সুমুখেই একটু খোলা ছাদ। রাধাতে আর টুলুতে মিলে সেখানে টবে-টবে ফুলগাছ লাগিয়েছে। তার মিঠে গন্ধ আসছে ভেসে। হঠাৎ মনে হ'ল ওরই এদিকের কোণে কে যেন ব'সে র'য়েছে। না, বসে নেই, ত্বরিত পদে কে যেন এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। সুনীল আঁচল বাতাসে দুলে উঠল।

উঠে বসলাম। ভুল দেখছি না তো? কিছু বিচিত্র নয়। মস্তিষ্কের এই রকম অবস্থায় অমন নাকি হয়। কিন্তু এখনও কার পায়ের মৃদুধ্বনি পাচ্ছি যে!

তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই দেখি, কে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠছে। আমিও তার পিছনে ছুটলাম। রাধার ঘরের সামনে ধরে ফেললাম।

—রাধা!

রাধা উত্তর দিলে না। আমার বাহুবেষ্টনের মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। পরিপূর্ণ চাঁদের আলো পড়েছে ওর মুখে। দুটি নয়ন নিমীলিত। ওর ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম।

বললাম, অমন ক'রে ছুটে পালিয়ে আসছিলে কেন?

রাধা নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে না। ওর শরীরের গ্রন্থি যেন শিথিল হ'য়ে এসেছে। দেহ এলিয়ে পড়েছে।

বললাম, কেন পালিয়ে আসছিলে?

রাধা অস্ফুটকণ্ঠে বললে, ভয় করছিল।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—দেখতে গিয়েছিলাম ঘুমিয়েছেন কি না।

রাধার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। ওর কথা জড়িয়ে আসছিল।

বললাম, কিছুতে ঘুম আসছে না রাধা।

ও জবাব দিলে না। আমার কাঁধের ওপর মাথাটি রেখে চুপ ক'রে প'ড়ে রইল।

বললাম, টুলু যেমন ক'রে চলে গেল এমন ক'রে তুমি একদিন যাবে না তো?

রাধা নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালে, যাবে না।

ওর মাথাটি বুকের আরও সন্নিকটে টেনে এনে বললাম, না, তুমি যেন যেও না রাধা, তুমি থাক। তুমি চিরদিন ধ'রে থাক।

আমার ঠোটের স্পর্শে ও একটিবার কেঁপে উঠল।

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL